KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, |
| Collection : KLMLGK | Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায় |
| Title : অগ্রিক | Size : 6"x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : 2/1<br>2/2<br>2/3-4<br>2/5 | Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৪৭<br>কার্তিক, ১৩৪৭<br>অগ্রহায়ণ, পৌষ - ১৩৪৭<br>মাঘ, ১৩৪৭ |
| | Condition : Brittle ✓ / Good |
| Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিজনময় চৌধুরী | Remarks : No. of Page missing |

C.D. Roll No. : KLMLGK

শারদীয় সংখ্যা—আশ্বিন, ১৩৪৭

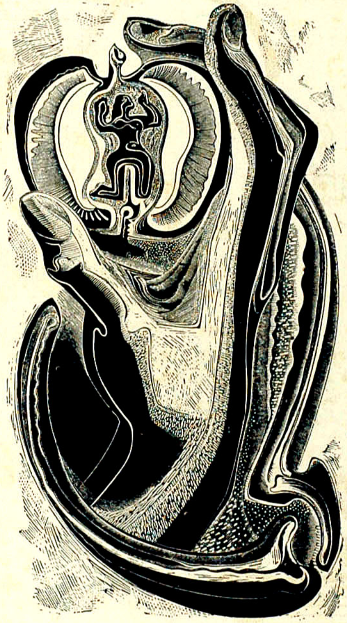

আ্যাডাম ও ইভ্

শিল্পী—জার্টুড্ হার্মেস্

কলিকাতা লিটল ... ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাত ... ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
... কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার ... কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা · আশ্বিন, ১৩৪৭

# মধ্যযুগের সাধনার একটি ধারা

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতবর্ষের প্রাচীনযুগের ইতিহাস উদ্ধার করতে আমরা কিছুদিন থেকে মনোযোগী হয়েছি বটে কিন্তু তা'র মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এখনও উদাসীন। অথচ মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গেই যে ভারতের চিন্তার ধারা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল তা' নয়। অনেক দেবমূর্ত্তি নষ্ট হ'য়ে থাকতে পারে, অনেক পুঁথি লুপ্ত হ'য়ে থাকতে পারে—কিন্তু ভারতের যে সাধনা হচ্ছে তা'র স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের উৎস, সেই উৎস ত' আর শুকিয়ে যায় নি। কোন বিশেষ দেবমন্দির বা পুঁথিতে সে চিন্তার ধারা আবদ্ধ ছিল না—তাই তার গতি ক্ষণকালের জন্য ব্যাহত হ'লেও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে যায় নি। মধ্যযুগে ভারতের এই চিন্তার ধারা কি ভাবে ভারতবাসীর জীবন রসময় ক'রে তুলেছিল, কি ভাবে সে নিত্য নূতন পথ বেয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মীর অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা মিটিয়েছিল—তা'র কোন খোঁজ আমরা রাখি না। অথচ তা' ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান অঙ্গ।

মধ্যযুগের এই চিন্তা বিকাশ লাভ করে'ছিল ভক্ত সাধকদের সাধনায়। এই সাধকদের ভিতর অনেকে ছিলেন সহজধর্ম্মী—যেমন, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। উত্তর ভারতে কবীর ও মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেবের ধর্ম্মেও সহজের কথা আছে। এ ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউলের ধর্ম্মে সহজের অনেক কথা আছে।

এই 'সহজ' বা 'সহজধর্ম্ম' কি? কেহ ইহাকে 'natural religion of man' মনে করেছেন, কেহ বা কবির ভাষায় বলেছেন যে সহজধর্ম্মী "মনের মানুষ খুঁজিতেছেন"। যাঁরা হয়ত সে সহজধর্ম্ম সত্যই জানেন তাঁরা আবার তা' ব্যক্ত করে বলতে চান না। চৈতন্যের পরবর্ত্তী সহজিয়াদের আচার-ব্যবহারের কথা শুনে অনেকে সহজধর্ম্মের নিন্দাবাদ করে আসছেন। অথচ যাঁরা সত্যই সহজধর্ম্মীদের সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা আবার কোন

নিন্দা খুঁজে পান না। প্রাচীন পুঁথিপত্রের সাহায্যে আমি এই সহজধর্ম্ম সম্বন্ধে যা বুঝেছি তা'রই কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করবো।

কবীরের সাখীসংগ্রহ আলোচনা করলে মনে হয় যে তিনি লৌকিক ধর্ম্মের আচার-ব্যবহার মান্‌তেন না। সেই জন্যই তিনি বলেছেন—

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুআ পণ্ডিত হুয়া ন কোয়।
একৈ অক্ষর প্রেম কা পঢ়ৈ কো পণ্ডিত হোয়॥
পঢ়ি পঢ়ি তো পথর ভয়া লিখি লিখি ভয়া জো ইঁট।
কবীর অন্তর প্রেম কী লগী নে একো ছীঁট॥

সারা জগৎ পুঁথি পড়ে মারা গেল, কিন্তু জ্ঞানী কেউ হোল না। প্রেমের এক অক্ষর পড়লেই সে জ্ঞানী হ'তে পারে। প'ড়ে প'ড়ে সারা জগৎ পাথরের মত চৈতন্যহীন হ'য়ে গেল, লিখে লিখে সে ইটের মত হ'য়ে গেল। কিন্তু কবীরের অন্তরের প্রেমে কোন ছাপ পড়ল না।

তীর্থ যাত্রা ও দেবপূজা সম্বন্ধেও কবীর ঐ একই মত পোষণ করতেন।

তীরথ ব্রত করি জগ মুআ জুড়ে পানী হ্নায়।
সত্ত নাম জানে বিনা, কাল জুগ ন জুগ খায়॥

তীর্থ-ব্রত ক'রে সারাজগৎ মারা গেল, কেবল তীর্থস্নানই সে বুঝেছে। কিন্তু সত্য নাম বিনা যে কলি যুগের থেকে সে অব্যাহতি পাবে না তা' সে বুঝলো না।

পাহন পানী পুজি কৈ, সেবা জাসী বাদ।
সেবা কিজৈ সাধকী সত্ত নাম কর য়াদ॥

পাষাণ আর জল পূজা করলে সেবা হয় না। সত্যনাম করাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় সেবা।

কবীরের ধর্ম্মে লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোন স্থান ছিল না, শাস্ত্রপাঠ, তীর্থব্রত বা দেবপূজা করায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাই বলেই যে তাঁর ধর্ম্ম সাধারণ অর্থে মানুষের 'স্বভাবজাত' (natural religion) ধর্ম্ম তা' বলা চলে না। 'সত্যনাম' তিনি বুঝতে বলেছেন সত্য, কিন্তু সে নাম শেখাবেন সদ্‌গুরু। কবীরের নিজ ভাষায় বলতে গেলে—

গুরু বিন্নু মালা ফেরতা গুরুবিনা করতা দান।
গুরু বিন্নু সব নিস্ফল গয়া বুঝৌ বেদপুরাণ॥

তাহ'লে গুরুই হচ্ছেন মন্ত্রদাতা। তিনি নাম না শেখানো অবধি পথের খোঁজ কেউ পাবে না। পথের খোঁজ যখন মিলবে তখনই সাধনা আরম্ভ হ'বে। সেই



সাধনায় উন্নীত হ'লে তবে 'সহজ' মিল্‌বে। এ সহজ কি? এ সহজ সকলে চেনে না।

সহজ সহজ সব কোউ কহৈ, সহজ ন চীহ্নৈ কোয়।
জো সহজৈ সাহিব মিলৈ সহজ কহাবৈ সোয়॥
সহজ সহজ সব কোই কহৈ সহজ ন চীহ্নৈ কোয়।
জা সহজৈ বিষয়া তজৈ বিষয়া কহাবৈ সোয়।
সহজৈ সহজৈ সব ভয়া মন ইংদ্রো কা নাস।
নিঃ কামী সে মন মিলা, কৌটী করম কী ফাঁস॥

সাধক যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ত্যাগ করতে পারবে তখনই সে সহজ লাভ করবে। যখন মনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হ'বে, যখন মন নিষ্কামী হ'বে ও সব কর্ম্ম বিনষ্ট হ'বে তখনই সহজ মিল্‌বে।

এই যদি 'সহজ' হয় তবে ইহা যে যোগমার্গের কথা তা'তে সন্দেহ নেই। যোগী তাঁর সাধনার খুব উন্নত স্তরে উঠেই মনেন্দ্রিয়ের বিনাশ করতে পারেন ও বাহ্য বস্তু থেকে তা'কে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন। এই সহজ সাধনার প্রথমতঃ বৌদ্ধদের ভিতরই প্রসার লাভ করে। তাঁরাই ছিলেন সহজের প্রথম দ্রষ্টা। এই সহজ দ্রষ্টাদের একজন প্রধান সিদ্ধ, যোগী তিল্লোপাদ বলেছেন—

কন্ধভূঅ আঅওণ ইন্দী
সহজসহাবেঁ সঅল বিবন্ধী॥
সহজে ভাবাভাব ণ পুচ্ছহ।
সুণ্ণ করুণ তঁহি সমরস ইচ্ছিঅ॥

স্কন্ধরূপ আয়তন ও ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ শক্তি নষ্ট হ'লেই সহজ স্বভাবের উৎপত্তি হয়। সহজে ভাবাভাব থাকে না। কারণ তখন মনেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। সহজ শূন্যজ্ঞান ও করুণাপূর্ণ ও তা'তে সমরস প্রবল। বৌদ্ধদের মতে জগৎ শূন্যময় অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের কোন বাস্তব সত্তা নেই। এই জ্ঞানের লাভ হ'লেই সমরসের উদয় হয়। এই সমরসকেই কবীর সমদৃষ্টি বলেছেন।

সমদৃষ্টী সৎগুরু কিয়া, ভর্ম কিয়া সব দুর।
ভয়া উজারা জ্ঞান কা, উগা নির্ম্মল সুর॥

নাথপন্থী যোগীরা এই সহজ সাধনা করতেন। তাঁদের সহজ ও বৌদ্ধদের সহজের থেকে পৃথক নয়। মৎসেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—

তং বিদিত্বা পরং রূপং মনো নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥

শব্দ রূপ রস স্পর্শ গন্ধশ্চৈবাত্র পঞ্চমঃ।
সর্ব্বভাবাশ্চ তত্রৈব প্রলীনাঃ প্রলয়ং গতাঃ॥
ভাবাভাব বিনির্মুক্ত উদয়াস্ত মন বর্জ্জিতঃ।
স্বভাব নির্ম্মলং শান্তং মনো যস্য মনোময়ং॥

সেই পরজ্ঞান লাভ হ'লে মন নিশ্চল হয়। শব্দ, রূপ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ও ভাব সমূহ বিনষ্ট হয়, মন তখন ভাবাভাব বিনির্মুক্ত হয় ও চঞ্চলতা শূন্য হয়। মন তখন স্বভাব নির্ম্মল ও শান্ত হয়।

সুতরাং এঁদের মতে মনের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে নির্ম্মল ও শান্ত। সেই হচ্ছে তা'র সহজ অবস্থা। সেই অবস্থায় মনকে ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে তা'কে নিক্রিয় কত্তে হ'বে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে তা'কে মুক্ত করতে হ'বে। মনের এই সহজ অবস্থা লাভ করবার জন্য বৌদ্ধ ও নাথপন্থীরা যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা' হচ্ছে হঠযোগ। কবীর ও চণ্ডীদাস প্রমুখ সহজ সাধকেরা যে সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চণ্ডীদাস যে সহজ সাধনা করতেন তা' প্রথমতঃ জনশ্রুতিতে জানা যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভিতর কতকগুলি পদে সহজ সাধনার কথা আছে। সাধন বিষয়ক পদগুলির চণ্ডীদাস "আসল চণ্ডীদাস" কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। "দ্বিজ চণ্ডীদাসকে" অন্য ব্যক্তি মনে করে' তাঁর পদ বাদ দিলেও সাধন বিষয়ক অনেক গুলি পদ চণ্ডীদাসের থাকে। এই পদগুলির থেকে ধরা যায় যে চণ্ডীদাস নান্নুরে থাক্‌তেন, বাশুলী দেবী তাঁকে "চাপড় মারিয়া" সহজ ভজনে উদ্বুদ্ধ করেন ও "রজক-ঝিয়ারী রামিণীকে ভজন" করতে আদেশ দেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের সঙ্গেও এই বাশুলী দেবীর সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে আসল চণ্ডীদাস যেই হোন না তিনি বাসলী বা বাশুলী দেবীর উপাসক ছিলেন, সহজ ভজন করতেন ও তাঁর সেই সাধনার সঙ্গে "রজক ঝিয়ারী রামিণী" জড়িত ছিল। এখন এই চণ্ডীদাসের "সহজ" কি তা' দেখা যাক্।

কবীরের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রায় কবীরের ভাষাতেই বল্‌ছেন—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার, সহজ জেনেছে সে॥

সুতরাং "তিমির অন্ধকার" বা মায়ামোহ অতিক্রম করলে সে সহজ পাওয়া যায়। এ তিমির অন্ধকার অতিক্রম করতে হ'লে চাই যোগ। সেই যোগ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও সাধন-বিষয়ক পদাবলীর চণ্ডীদাস উভয়েই জানেন।



অহোনিশি যোগ ধেয়াই।
মন পবন গগনে রহাই।
মূল কমলে করিলে মধু পান।
এবেঁ পাইঅাঁ আহ্মে ব্রহ্ম গেয়ান। (কৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৫৮)

এই মূলকমল হচ্ছে সহস্রদল পদ্ম। যোগী নিজের দেহের মধ্যে অষ্টপদ্ম কল্পনা করেছেন। তার উপর অষ্টদল পদ্ম। অষ্টদল পদ্ম ছেড়ে আরও উপরে উঠলে সহস্রদল।

এই অষ্টপদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।......
সহস্রদল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পথ নিত্য বস্তুর আধার হয়।
রতিস্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে। (পদাবলী)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কুণ্ডলিনী অষ্টদলে উঠলে 'স্থির রতির' অবস্থা হয় ও সহস্রদলে উঠলে "ব্রহ্ম গেয়ান" বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সেই দুই অবস্থাই হচ্ছে নিত্য বস্তু বা সহজ।

চণ্ডীদাসের সাধন-বিষয়ক পদগুলির অর্থ নির্দ্ধারিত হয়নি। সেগুলির অর্থ স্পষ্ট ধরতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁর সহজসাধনা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। কিন্তু সে সহজ যে বৌদ্ধ সহজযান, নাথপন্থী ও কবীরের সহজেরই অনুরূপ তা'তে সন্দেহ নেই।

চণ্ডীদাস যদি যোগ অবলম্বন করেই সহজ সাধনা করে থাকেন তবে "রজক ঝিয়ারী রামিণী"কে? বাশুলীই তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন :—

ভজন তোমারি রজকঝিয়ারী রামিণী নাম যাহার।

এই রজকিনীকে নিয়েই যত গোলমাল বেধেছে। কেহ কেহ মনে করেছেন এ একজন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক এবং এর সংসর্গে আস্‌বার জন্যই চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। কেহ বা চণ্ডীদাসকে উঁচুদরের সাধক প্রতিপন্ন করবার জন্যই এই রজকিনীকে কাল্পনিক মনে করেছেন। চণ্ডীদাস নিজে এই রজক-ঝিয়ারীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা অবধানযোগ্য।

রজকিনী রূপ কিশোরী-স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন দেখিলে পরাণ জুড়ায়।
তুমি রজকিনী আকার রমণী তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

তুমি কাদম্বিনী হরের ঘরণী তুমি সে গলার-হার।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত তুমি সে নয়নের তারা।

এই যদি হ'ন 'রজকিনী' তাহ'লে তাঁকে বাস্তব মনে করবার কি কারণ আছে? চণ্ডীদাসের আরাধ্য দেবতা বাশুলী—তিনি থাকেন "রসিকনগরে"। রসিকনগর বা প্রেমসরোবর হচ্ছে অষ্টদল পদ্ম। তাহ'লে বাশুলী অষ্টদলে বিরাজ করেন। তাঁকে ধরতে হ'লে রজকিনীর সাহায্য চাই। বাশুলী নিজেই চণ্ডীদাসকে সে পরামর্শ দিচ্ছেন।

হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডীমহাশয়, আমি থাকি রসিকনগরে।
সে গ্রামের দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে।
সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।

এই রজকিনীর অন্য খোঁজও মেলে। বৌদ্ধ সহজসাধকেরা পঞ্চকুলের কথা বলেছেন। এ পঞ্চকুল হচ্ছে—ডোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী। সাধনমার্গে সাধকের এই পঞ্চকুলের কোন একটাকে বেছে নিতে হয়। অবশ্য গুরু মন্ত্র দেবার সময় সেটা ঠিক করে দেন। কারণ তিনি হ'লেন মন্ত্রদাতা—শিষ্য কোন্ পথ অবলম্বন করে সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারবে তা তিনিই বুঝ্‌তে পারেন। প্রাক্তন কর্ম্মফলে শিষ্য অধ্যাত্ম জগতে কোন্ স্তরে এসে উপনীত হয়েছে তা তিনিই বুঝতে পারেন—এবং সেই অনুসারে তা'র কুল নির্দ্ধারণ করে ঠিক পথটা দেখিয়ে দেন। বৌদ্ধ সাধকেরা যে পাঁচটি অধ্যাত্ম-কুলের খোঁজ পেয়েছিলেন—তার মধ্যে একটা হচ্ছে রজকী! কোন কোন সাধককে এই রজকীকে অবলম্বন করেই সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হয়। চণ্ডীদাসের "রজকঝিয়ারী" ও এই "রজকী" অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। তাই চণ্ডীদাস তাঁকে "হরের ঘরণী" "রাধিকা স্বরূপ" বা "পিতৃমাতৃ" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন।

# সঞ্চয়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গলা-বন্ধ কোটের পাঁচটি বোতামের একটিও যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ, উদার বক্ষে, সীতানাথবাবু সেটা গায়ে রাখেন। পঞ্চমতমটিও যখন বিদায় নেয়, তখন কিছুকাল কোটের মধ্যছিদ্র দুটি সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে। প্যাণ্টালুন যেহেতু জুতোর কাছেই এসে শেষ হয়েছে সেহেতু মোজা পরার কোনো মানে হয় না, একটু অবহিত থেকে পায়ের উপর পা না তুলে বসলেই চলে যায়। আর, উদ্যত যম-মুষ্টির মতো টুঁটি-টেপা কলার পরার চেয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ দেয়া সহজ।

আরো একটু বলি, ওঁকে চিনতে সুবিধে হবে। শীতে-বর্ষায় পায়ে তাঁর একই ক্যাম্বিশের জুতো, তাঁর সমতল জীবনযাপনের নিষ্কলঙ্ক উদাহরণ। নিষ্কলঙ্ক বলছি, কেননা জুতো কেনার পর থেকে এ পর্যন্ত তাতে খড়ির দাগ পড়েনি। যেহেতু ওটার দাম চোদ্দ আনা সেহেতু ওটাকে চোদ্দবছর পদবাসে রেখেছেন বলে গর্ব করেন, আর বলেন, যত কড়াক্কড়ি পোষাক নিয়েই হয়েছে, জুতোর উপর কেউ হাত দিতে পারে নি। কবিরাজ বলেছে বলে বাড়িতে কাঠের উনুনে রান্না হয়, এবং প্রত্যহ ভোরে উঠে তাঁর প্রথম প্রাতঃকৃত্য হচ্ছে রান্নার জন্যে ঠিক গুনে-গুনে দশখানি লকড়ি বের করে দেয়া। যজ্ঞের রান্নাও যদি রাঁধো, দশখানির বেশী লকড়ি পাবে না। আর, মিষ্টি তিনি নিজে না খেলেও ছেলেপুলের সংসার থেকে সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া চলে না, তাই তিনি বাতাসা চালিয়েছেন। আর, সে-বাতাসা সংগৃহীত হতো বাজার থেকে নয়, কালীবাড়ি থেকে। মা-কালীর প্রসাদ সেই বাতাসা, ভারি সস্তায় তা বিকোয়, এক ধামা চার পয়সায়। মুঠো-মুঠো খেলেও চলে প্রায় মাসখানেক।

শান্ত, শীতল জীবন, বয়েসও প্রায় ছেচল্লিশ। শুধু দুটো জিনিসে তাঁর ভয়, এক চিনি, আরেক উপরালা। নতুবা বইয়ের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাওয়ার মতই তাঁর দিনগুলি।

এ হেন সীতানাথবাবুর স্ত্রী প্রভাতকুসুম। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ, বেশ খটখটে আধুনিকা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়েসেই বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, স্ত্রীর পরামর্শেই তাঁর সমস্ত ব্যয়সঙ্কোচ, কেননা প্রভাতকুসুম সর্বক্ষণই এটা বোঝে যে

লোকের অর্থের পরিচয় কী সে দেখায় তাতে নয়, কী সে লুকোয় তাতে। অতএব বেয়ারিং ইন্সাকিতে খরচ না করে দু'টো পয়সা এদিক-ওদিক সরিয়ে ফেলতে পারলেই আখেরে তার একটা হিল্লে হবার সম্ভাবনা।

প্রভাতকুসুমের বোনঝির বিয়েতে সবাইকে নিয়ে সীতানাথবাবু কোলকাতা গিয়েছেন—গল্পের সূত্রপাত এইখানে। মোটে চারদিনের ছুটি, বিয়ে দেখে সীতানাথবাবু একা ফিরে এসেছেন স্বস্থানে, ছেলেপুলে নিয়ে প্রভাতকুসুম থেকে গেছে তার বোনের বাড়িতে—গল্পের এইখেনেই পরিণতি।

খুচরো ছুটিতে যখনই কোথাও যান, পাড়ায় থাকে আপিসের য়্যাকাউন্ট্যান্ট, কমলকৃষ্ণ, তার উপরে বাড়ির ভার থাকে। ঠাকুর-চাকরকে বিশ্বাস নেই। অথচ বাড়িতে তাঁর কী-ই বা আছে, শুকনো একখানা গামছা, কোণছেঁড়া একটা ছাতা, আর, বড়ো জোর, কড়িকাঠের সঙ্গে ঝোলানো লেপের ছালাটা। নচেৎ, সমস্ত অস্থাবর মালামালই তো তিনি আপিসের মালখানায় বন্ধ রাখেন। তবু, একটা মগ খোয়া গেলেও তো ছ'টা পয়সা গুনগার যায়।

খাসকামরায় বসে একটু শ্লথ-সুস্থ হবার আগেই গুম্ফগম্ভীর মুখে কমলকৃষ্ণ এসে উপস্থিত।

'ঘর-দোর সব ঠিকঠাকই ছিলো।' মামুলিভাবে বললেন সীতানাথবাবু।

'কিন্তু এদিকে একটা কাণ্ড ঘটেছে।' কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে কমলকৃষ্ণ বললে।

'কী কাণ্ড? কোথায়?'

'আপনার বাড়িতে।'

'আমার বাড়িতে? বলেন কী? কবে?' সীতানাথবাবু খাড়া হয়ে উঠলেন।

'এই ছুটির মধ্যে।' তারপর কাহিনী যা বললে কমলকৃষ্ণ, সেটা কোনো চুরি বা ডাকাতি নয়, ছোটখাটো একটি উপন্যাস। কাহিনীটা এই:

গত পরশু দুপুর বেলা, একটা কি দেড়টার সময়, দূরে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে কমলকৃষ্ণ রাস্তায় বেরিয়ে আসে, যেন কোথায় দাঙ্গা বেধেছে এমনি গোলমাল। এগিয়ে এসে দেখে, সীতানাথবাবুর বাড়ির কাছেই সে চেঁচামেচি। অসংখ্য লোক ঢুকে পড়েছে তাঁর কম্পাউণ্ডে, বেশির ভাগই হিন্দুস্থানী বাথুয়া, আশে-পাশে আলগা লোকও জমেছে মন্দ নয়। ব্যাপার কী? খোঁজ নিয়ে জানলো কমলকৃষ্ণ, কেলেঙ্কারির একশেষ, বাথুয়াদের কার একটা মেয়ে রয়েছে নাকি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে, আর সীতানাথবাবুর ঠাকুরই নাকি তাকে বাইরে আসতে দিচ্ছে না। বাবুর বাড়ি বলেই ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ, কিন্তু ভালো চায় তো, তাদের



আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

মেয়ে এক্ষুনি ফিরিয়ে দিক, নইলে কাঠ আর কেরোসিন এনে আগুন ধরিয়ে দেবে তারা। ভিতরে গিয়ে খবর নিলো কমলকৃষ্ণ, একটুও বানানো নয়, বারান্দার এক কোণে দরজার আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে বাথুয়াদেরই একটা মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

'কী বাথুয়া-বাথুয়া করছেন', সীতানাথবাবু হঠাৎ বিরক্তমুখে ধমক দিয়ে উঠলেন: 'বাথুয়া বলে কাকে?'

বাথুয়া হচ্ছে একরকম হিন্দুস্থানী মাঝি, চালানী নৌকোয় যারা দেশ-বিদেশে মাল বয়, আর যাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী-কন্যারা দুধ বেচে শাক-সব্জি বেচে মুড়ি-চিঁড়ে বেচে অন্নসংস্থান করে—সবিনয়ে বুঝিয়ে দিলো কমলকৃষ্ণ। বললে, 'আপনার বাড়ির কিছুটা পশ্চিমে ওদের বসতি। আন্দাজ তিরিশ-চল্লিশ ঘর আছে।'

'তারপর মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে তাড়িয়ে দিলেন কিনা বলুন।'

'ঠাকুরকে বললুম সোজাসুজি বার করে দিতে। মেয়েটা পাছে মার খায় তাই সে প্রথম সাহস পাচ্ছিলো না। পরে—'

'মার কেবল একলা মেয়েটাই খাবে সে ভেবেছে নাকি?' সীতানাথ বাবুর সর্বাঙ্গ রাগে রক্তময় হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো এখুনিই বাড়ি ফিরে পা থেকে জুতো খুলে ঠাকুরের পিঠটা জর্জরিত করে তোলেন। জুতোর শক্তির কথা ভেবে একটু তিনি চিন্তিত হলেন হয়তো; ভাবলেন, জুতো ছেড়ে ছাতার শরণাপন্ন হওয়াটাই শোভনীয় হবে। কিন্তু প্রহারের প্রাবল্যে ছাতাটা ভেঙে গেলে অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। অতএব, যা থাকে কপালে, রান্নার কাঠই একখানা কমবে না-হয়।

'পরে, খিড়কির দোর খুলে চুপি-চুপি মেয়েটাকে বার করে দিলুম। ও দিকটাতে জঙ্গল আর বাঁশবন, কোনো লোক ছিলো না। আর, লোক থাকলেই বা কী,' গুম্ফপ্রান্তে কমলকৃষ্ণ একটু হাসলো, 'ছাড়া পেয়েই মেয়েটা সোজা ছুট দিলো, এক নিশ্বাসে মিশে গেল হাওয়ায়।'

'ছুট দিলো কী মশাই?' সীতানাথবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'মেয়েছেলে কখনো ছুটতে পারে?'

'ঠিক একটা হরিণের মতো ছুটে পালালো। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। মনে হলো যেন রোদ্দুরে একটা ধারালো তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল হঠাৎ।'

'থাকেন তো চালান আর পেমেণ্ট-অর্ডার নিয়ে, এত কবিত্ব শিখলেন কোথায়?'

কমলকৃষ্ণ লজ্জিত হলো।

'ছুটলো যে, বয়েস কত মেয়েটার?'

'আঠারো-উনিশ হবে।'

'সে তো একটা ধাড়ী মশাই। নির্লজ্জের মতো ছোটে কী করে?'

'কিন্তু ভারি ছিপছিপে আর পাৎলা। তা ছাড়া, তখন তার ধরা পড়ার লজ্জার চেয়ে মার খাবার ভয়ই বেশি।'

'আপনার তো তাকে মার খাওয়ানোই উচিত ছিলো। খিড়কির দোর খুলে দিয়ে পালাতে দিলেন কেন?' সীতানাথবাবু বক্র চোখে জিজ্ঞেস করলেন।

'নইলে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হতো। তা ছাড়া, মেয়েটার অবস্থা দেখে তখন একটু মায়াও যে না হয়েছিলো তা নয়।'

'যান, যান, চাকরির মায়াটাই সর্বাগ্রে।' হঠাৎ বিষয়বহির্ভূত ভাবে বলে উঠলেন সীতানাথবাবু। 'পরের মেয়ের উপর বেশি মায়া দেখানোটা ঠিক নয়।'

কথাটা নির্ব্যক্তিক ভাবে বলা হলো বলেই কমলকৃষ্ণকে স্পর্শ করলো না। চলে যাচ্ছিলো, থেমে পড়ে সে বললে, 'ও-ঠাকুরকে রাখা তো নিশ্চয়ই ঠিক হবে না।'

'ঠিক? হারামজাদাকে আমি কাঠ-পেটা করে তাড়াবো।'

'তাই আরেকটা ঠাকুর জোগাড় করে রেখেছি।'

'বেশ, পাঠিয়ে দেবেন।'

সাধারণত ঠাকুর বললে যা বোঝায় সীতানাথবাবুর ঠাকুর তার সংজ্ঞাভুক্ত নয়। তার নাম কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়ি বরিশাল জেলায়—ঝালকাঠি না নলচিঠিতে। থার্ড-ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলো, পয়সার অভাবে আর এগুতে পারেনি, অগত্যা বামুনের ছেলের পক্ষে সনাতন যে পথ, চলে এসেছে সে রান্না ঘরে, ষোলবছর বয়সে। সীতানাথবাবু তখন ভোলায়, মোটর-টায়ারের স্যাণ্ডেল পায়ে একমাথা উস্কখুস্ক চুল নিয়ে কিশোরী যখন তাঁর কাছে এসে হাত পাতে। ছ' টাকা মাইনের উড়ে ঠাকুরকে এক কথায় বরখাস্ত করে তিন টাকা মাইনেতে কিশোরীকে তিনি বহাল করেন। তারপর বারো-তেরো বছর কেটে গেছে, কিশোরীর মাইনে এখন সাড়ে-সাত। তবু, সর্বসাকুল্যে, ওকে পেয়ে অনেক সুবিধে, কেননা মাইনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও তাকে দিতে হয় না, দাড়ি কামাবার জন্যেও নয়।

ভীষণ বাবু ছিলো কিশোরী। ধোপাবাড়িতে সীতানাথবাবুর যেত যেখানে তিন-খানা, কিশোরীর যেত ছয় খানা। বালিশের ওয়াড়ও যে ধোপাবাড়িতে দেয়া চলে, এ শুধু সীতানাথবাবু কিশোরীকে দেখে শিখেছেন। কিছু বলতে পারতেন না, কেননা কিশোরীর আলাদা ধোপা। নাপিতের কাছে নখ কাটবার যখন সময় হতো তখনই দাড়ি কামাতেন সীতানাথবাবু, কিন্তু কিশোরীর মুখটা নির্মূল নির্মল হয়ে সবসময়েই ঝকঝক



করছে। সাতশো টাকা মাইনেতে তাঁর একটা টাইম-পিস হয় না, থানার ঘণ্টা বা কোর্টের ঘণ্টা (এদের কোন একটার কাছে তিনি বাসা নেন) শুনে তাঁর কাজ চলে, আর মাত্র সাড়ে-সাতটাকা মাইনেতে কব্জিতে সে দিব্যি ঘড়ি বেঁধেছে। শোনা যায়, পকেট থেকে বার করে নাক-টেপা চশমাও নাকি পরে মাঝে মাঝে এবং নিরাপদ দূরত্বে চলে এলে কখনো-কখনো তার হাতে একটা ছড়িও নাকি ঘূর্ণ্যমান হয়। এখানে আসবার সময় হাতে-বওয়া মাল-পত্র দিয়ে সীতানাথবাবু তাকে দু'দিন আগে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়ে যারা এসেছিলো ইষ্টিশানে, সবাই ভেবেছিলো সেই সীতানাথবাবু। নাজিরকে উজীরবাবু বলে সম্ভাষণ করার পর নাকি সবাইর ভুল ভাঙে। পরে নাকি সে সহরে বলে বেড়িয়েছে, সীতানাথবাবুর সে বড়ো ছেলে, আগের পক্ষের, এবং সেই হেতুই একটু বাবু ও বখা। কেউই অবিশ্বাস করতে পারেনি।

'ঠাকুর!' বাড়ি ফিরে এসে সীতানাথবাবু আশ্বিনের মেঘগর্জন করলেন।

কিশোরী ভয়ে-ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো তার চাউনি।

'যা শুনেছি তা সত্যি?'

কিশোরী মাথা নামিয়ে রইলো।

'কি, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে! সত্যি?'

'সত্যি।'

'সত্যি!' ধাঁ করে সীতানাথবাবু কিশোরীর গাল, কান ও ঘাড় লক্ষ্য করে প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন। উঠলেন হুঙ্কার করে: 'তোমাদের জিম্মায় বাড়িঘর রেখে যাই এ সব কেলেঙ্কারির জন্যে? ভদ্রলোকের ছেলে, এ সব দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে? ছি ছি ছি!'

কিশোরী চুপ করে রইলো।

'কে ওই মেয়েটা? পেলে কী করে?'

কিশোরী কথা বললো না।

'নাম কী?'

'দাসীয়া।' অস্ফুটস্বরে কিশোরী বললে।

'আমাদের দুধউলির মেয়ে বুঝি?'

'না।'

'তবে কার মেয়ে? ঠিক করে বলো।' সীতানাথবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন।

'জানিনা।'

'জানো না!' সীতানাথবাবুর ছুই পাটি দাঁত দৃঢ়সংযুক্ত হলো এবং মুখের অভ্যন্তরে একটা বর্বর শব্দ উত্থিত হয়ে নির্ঘোষ অবস্থাতেই মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পরে তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বললেন, 'এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে।'

কিশোরী কাকুতি করে বললে, 'মুহূর্তের জন্যে একটা ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা-টমা আমার নেই। আমি ক্ষমা করলেও তোমার মা কিছুতেই করবেন না। যাও, বেরিয়ে যাও।' সীতানাথবাবু তার ঘাড়ে আরেকটা ধাক্কা মারলেন। আর [illegible]ন এমন যে সুচরিত্র সে যেন ভাঙা মাসের মাইনের কথা মুখ ফুটে না উচ্চারণ করে।

রাত্রেই নতুন ঠাকুর বহাল হলো, আপাততো পাঁচ টাকায়, এবং কথা হলো রান্না যদি সে ভালো করে তবে তিন মাস পরে তার এক টাকা উন্নতি হবে। আসলে, তাঁর দিক থেকে ব্যাপারটা লাভজনকই হলো, ভাবলেন সীতানাথবাবু, এবং প্রথম রাত্রি থেকেই নতুন ঠাকুরের রান্নার তিনি ত্রুটি ধরতে লাগলেন।

কিন্তু, কে জানে, অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে তাঁর ঘুম এলো না। যেন হঠাৎ তাঁর নিজেকে বড়ো বেশি একাকী মনে হলো। এত বড় ফাঁকা বাড়িতে একলা থাকবার তাঁর অভ্যেস নেই কোনোকালে, এত বড় তক্তাপোষে। যেন দেয়ালে কিসের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে বারান্দায় যেন কার চাপা পায়ে আনাগোনা, যেন দরজার কাঠ ছুটো আপনা থেকেই শব্দ করে উঠছে। তারপর অনেক রাতে যখন তাঁর ঘুম এলো তিনি একটা অদ্ভুত ছুঃস্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, এমন এক জায়গায় গিয়েছেন যেখানে পোষ্টাফিস নেই। তাঁর সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়েছে, প্রভাতকুসুমকে কোলকাতায় টেলি করা দরকার, কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না পোষ্টাপিস। মাঠ-জঙ্গল পাহাড়-নদী পার হয়ে তিনি ছুটছেন, উৎকণ্ঠ হয়ে আকাচ্ছেন আকাশের দিকে, কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের একটা তন্তুও তাঁর চোখে পড়্লো না।

সকালে বরার্দ্দ ঘোল দিয়ে গেল চাকর। নথি-পত্র থেকে মুখ তুলে চশমাটা এক ঠেলায় কপালের উপর তুলে দিয়ে সীতানাথবাবু হঠাৎ জিগগেস করলেন, 'তুই ঐ মেয়েটাকে চিনিস?'

ফেকুলালের বুঝতে মোটেই দেরি হলো না। বললে, 'না, হুজুর।'

'তুই তখন ছিলি কোথায়?'

'আমি তখন পানের দোকানে গিয়েছিলাম পান কিনতে।'

'আমরা চলে গেলে বাড়িঘর তোরা এমনি করেই পাহারা দিস! কেন, পান খেতে দোকানে যাওয়া কেন, বাড়িতে জোটে না?' সীতানাথবাবু রুখে উঠলেন, 'ফের যদি



বাড়ি ছেড়ে যাবি কোনদিন ছুপুরে, ঠিক তাড়িয়ে দেব বলে রাখছি। হিন্দুস্থানী চাকর রেখে আমার কিছু লাভ নেই, আমি বাঙালী চাকর রাখবো।'

বলে তিনি পুনরায় নথিতে মনোনিবেশ করলেন। চশমাটা কপাল থেকে হাত দিয়ে নামাতে হলোনা, কপাল ও নাকের যুগপৎ আকুঞ্চনেই ওটা নাকের উপর আপনিই নেমে বসলো।

সান্ধ্যভ্রমণের পৃথিবীটা তাঁর খুবই পরিমিত ছিলো, কিন্তু সেদিন যখন তিনি পশ্চিমের গ্রাম্য ও বন্য পথের দিকে পা বাড়ালেন, পৃথিবীকে হঠাৎ যেন তাঁর খুব বড়ো বলে মনে হলো এবং স্পষ্ট অনুভব করলেন যে উত্তরমেরুতে না গিয়েও উত্তরমেরু-আবিস্কারের রোমাঞ্চটা ছুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এক হাত রাস্তাও কি তাঁর শান্তিতে চলবার উপায় আছে? প্রতি হাতে এক হাতে কারু আদাব, ছুই হাতে কারু নমস্কার। প্রতি পদে তিনি চিহ্নিত, অনুসৃত, ভয়প্রাপ্ত। অদৃষ্টের কী বিড়ম্বনা, তাঁর জন্যে একটুখানি কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই, তাঁকে চেনেনা এমন একটিও কোথাও লোক নেই কথা বলবার। তাঁর জন্যে সবাই যেন ভীষণ ব্যস্ত, ভীষণ জাগ্রত, হাই তুললে তুড়ি দেবার জন্যে ও হাঁচি দিলে জীব বলবার জন্যে সবাই এগিয়ে রয়েছে। আর কতদূর গিয়েছেন কি, কেউ অযাচিত বলে বসবে বাকি পথটা ছুর্গম, কর্দমাক্ত, কেউ বলবে একজোড়া সাপ আছে এই ঝোপের মধ্যে, কেউ বা বলবে কাদের গোয়ালে গরুর বসন্ত হয়েছে। এ-অঞ্চলটার ভূগোল বা ইতিহাস নিয়ে কারু সঙ্গে যদি বা তিনি আলোচনা করেন সে এমন একটা ভাব দেখায় যেন বাথুয়ারা সমগ্র এশিয়া মহাদেশেরই বহির্ভূত।

তবু, বলা বাহুল্য, সীতানাথবাবু গ্রামের সেই পাশ্চাত্ত্য পথটুকু ধরেই বৈকালিক আনাগোনা করেন। যেটুকু সম্ভব এর-ওর শশা বা চালকুমড়ো, পুঁইশাক বা ট্যাঁড়স নিয়ে উৎসাহ দেখান, গরুর চরবার জন্যে মাঠ কোথায় পাওয়া যায় সেই সমস্যায় আন্দেলিত হন, আবাদের মুখে ঠিক বৃষ্টি না পাওয়ায় ফসল কেমন পাওয়া যাবে তাই নিয়ে মাথা ঘামান। আর যখন বাড়ী ফিরে এসে অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে ক্যানভাসের ইজি-চেয়ারে পড়ে থাকেন, রক্তের চাপ বাড়ার জন্যেই হয়তো বোজা চোখের মধ্যে ছোট-ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখেন, মনে হয়, বাইরে যেন অসম্ভব রোদ আর সেই রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে একটা ধারালো তলোয়ার।

এত বড়ো বাড়ি ছেড়ে সীতানাথবাবুর হঠাৎ নদীর ওপারে ডাক-বাংলোয় গিয়ে থাকবার ইচ্ছে হলো। সামনেই বালির চর, বেশ নির্জন জায়গা। যেন সেখানে যেতে পারলেই তাঁর ঘুম আসে। কিন্তু ডাক-বাংলোর মালী যখন তাঁকে জিগগেস করবে, বাড়ি ছেড়ে তিনি এই বনবাসে কেন, তিনি কী উত্তর দেবেন?

অসম্ভব। অগত্যা তিনি স্বদেশে নিধনং শ্রেয় কল্পনা করে ফেকুলালেরই শরণাপন্ন হলেন। বললেন, 'তুই তো একটা ভূত, তোকে দিয়ে কোনো কাজই হবার জো নেই। পারবি, পারবি একটা ঠাকুর জোগাড় করে আনতে ?'

'ঠাকুর !' ফেকুলাল ভ্যাবাচাকা খেল। বললে, 'কেন, আছে যে একটা ?'

'ওটা আবার রাঁধতে পারে নাকি ? টক রান্না করতে গিয়ে টকই দেয় না, ওটা তো জাম্বুবান, তোর মাসতুতো ভাই। শোন', সীতানাথবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'যে করে হোক কিশোরীঠাকুরকে ধরে আনতে হবে।'

ফেকুলাল আরো ভ্যাবাচাকা খেল। বললে, 'সে তো কবে চলে গেছে।'

'সে চলে গেছে কিন্তু মেয়েটা তো যায়নি। নিশ্চয় তার কাছে কিশোরী ঠাকুরের ঠিকানা আছে। নিশ্চয়ই তার কাছে সে চিঠি লেখে। নিশ্চয়। ওকে জিগগেস করলেই জানা যাবে ঠিক।'

ফেকুলাল ঢোক গিললো। বললে, 'আমি তো মেয়েটাকে চিনিনা।'

'আমি চিনি।' সীতানাথবাবু জোর দিয়ে বললেন। 'মেয়েটার নাম ছুখিয়া। নাম জিগগেস করলেই ওকে তোর বার করতে দেরি হবে না।'

'কিন্তু ঠাকুরের ঠিকানা বললে আমি তা মনে রাখতে পারবোনা, হুজুর।'

'তুই যে একটা আস্ত গাড়োল, মনে রাখবি কী করে ? বেশ, মনে রাখতে না পারিস ছুখিয়াকে বলিস আমার সঙ্গে যেন এসে দেখা করে।'

ফেকুলাল যেন নিজেকে অনেক হালকা মনে করলো। বললে, 'কখন বলবো দেখা করতে ?'

'কী বলিহারি তোর বুদ্ধি ! সকালবেলাটা তো কাজকর্মেই ডুবে থাকি, তখন সময় কোথায় ? ছুপুরে তো অ্যাপিস, স্বচক্ষেই দেখতে পাস। বিকেলে বাড়ী এসে খবরের কাগজ পড়তেই লেগে যায় ছু ঘণ্টা। বেড়িয়ে ফিরে সন্ধের পর একটু যা ফাঁক পাই, তখনই ছুটো যা কথা কইবার সময়। বুঝলি, তখনই আসতে বলবি।'

ফেকুলাল সম্মত হলো। এবং তখুনি সীতানাথবাবুর মনে হল যেন সমস্তর কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। যেন সবাই শুনে ফেললো তাঁর কথা, শুনে ফেললো তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাস। যেন তাঁর জুতোর ভিতর থেকে পায়ের কদর্য আঙুলগুলি রাস্তার মাঝখানে সবাইর সামনে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো।

ফেকুলালকে তিনি মূর্খ ভেবেছিলেন, কিন্তু গলার স্বর সে অনেক খাদে নামিয়ে এনেছে। তার মুখ দেখে উৎসাহ না পেলেও কণ্ঠস্বরে অনুপ্রাণনা ছিলো। সে বললে, 'ছুখিয়া বলে কেউ ওখানে নেই হুজুর।'



'থাকলে আর তোমাকে সবাই ভূত বলবে কেন ?'

'আমি, হুজুর, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ছুখিয়া এক ছিলো, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি, গত ছট-পরবের সময় কলেরা হয়ে মারা গেছে।'

'আর, আশ্চর্য, তুই কিনা এখনো বেঁচে আছিস।'

'তবে—' চারদিকে চেয়ে ফেকুলাল থামলো।

'তবে—' সীতানাথবাবু তাকে ধরিয়ে দিলেন।

'তবে লখিয়া বলে একজন আছে।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লখিয়া—সীতানাথবাবু আলোড়িত হয়ে উঠলেন, লখিয়া, লক্ষীই মেয়েটার নাম। মামলার বাদিনী রাজলক্ষ্মী তাঁর রায়ে রাজকুমারী হয়েছে বটে, জরিমনেছা হয়েছে করিমনেছা, কিন্তু এমন মারাত্মক বিপর্যয়ের সেখানে আশঙ্কা ছিলো না। ফেকুলাল আপিল-আদালতের মতো ভুল তাঁর শুধরে নিয়েছে কিন্তু ডিক্রি নাকচ করেনি।

নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সীতানাথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কী বললে লখিয়া ?'

'আসতে রাজি আছে কিন্তু টাকা চায়।'

'টাকা !' কিশোরীর উপর প্রদত্ত চড়টা যেন দ্বিগুণ বিক্রমে সীতানাথবাবুর উপর ফিরে এলো। বহুবিস্মৃত ঝিনঝিনিয়া রোগে তিনি যেন হঠাৎ আক্রান্ত হলেন, মনে হলো এখুনি যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে পড়ে যাবে। ঢালের যে একটা ও-পিঠ আছে সেটা তাঁর যেন খেয়ালই হয়নি। ঊর্ধ্বচক্ষু হয়ে জিগগেস করলেন, 'টাকা কিসের ?'

'তা জানি না।'

'কিশোরী ঠাকুরের ঠিকানাটা এসে বলে যাবে তাতে টাকা লাগে কী করে। তুই কি ল্যালাখ্যাপা নাকি ?'

'কী করে বলবো ?'

'ক' টাকা শুনি ?'

'এক-আধটা নয়, পঁচিশ টাকা।'

'কি, কী বললি ? বল তো শুনি আরেকবার—' বলে কী শোনবার চেষ্টা করতে-করতে সীতানাথবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ারের মধ্যেই টলে পড়লেন।

চাকর-ঠাকুর তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলো। লোকজন ডাকতে যাবে এমন সময় চোখ চেয়ে সীতানাথবাবু তাদের বারণ করলেন। ঠাকুরকে বললেন, 'আমাকে একটু মকরধ্বজ শুধু মেড়ে দাও। ঐ কাগজের বাক্সটাতে আছে আর একটু গরম দুধ। ব্যস্ত হয়ো না তোমরা, চোটটা আমি খুব সামলে নিয়েছি।'

এর পর প্রভাতকুসুম আর দেরি করতে পারলো না, দুদিনের মধ্যেই সদলে ফিরে এলো। এসেই নতুন ঠাকুর দেখে সে ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। বললে, 'এ কী, পুরোনো ঠাকুর গেল কোথায় ?'

দুর্ধর্ষ ঘৃণায় সীতানাথবাবু বললেন, 'ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কেন ?'

সীতানাথবাবু পুঙ্খ পুঙ্খ করে সবিস্তার সে কাহিনী বললেন, যতটুকু শুনেছেন ও যতটুকু শোনেন নি সমস্তটুকু একত্র করে। তাঁর শরীরটা বিশেষ সুস্থ নয় ও অস্ত্র-আয়ুধগুলি খুব শক্তিমান ছিলো না বলেই যে প্রহারটা বিশেষ পরাক্রান্ত হতে পারেনি তারও জন্যে একটু অনুতাপ করলেন।

'আহাহা, তাতে কী হয়েছে ?' প্রভাতকুসুম বিদ্রূপ করে উঠলো। 'তারি জন্যে এত দিনের একটা tried handকে তুমি এক কথায় তাড়িয়ে দিলে ? আসলে, অপরাধটা ও করেছে কী ! তোমার সব তাতেই সাধুগিরি ফলানো। কমলবাবুর তো মেয়েটার জন্যে মায়া হলো, আর ওর জন্যে তোমার একটুও মায়া হতে পারলো না ? তোমরা তো বিচার করো না, butchery করো।'

কিশোরীকে না তাড়ালেই যে ভালো ছিলো তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু ঘটনাটা প্রভাতকুসুম এমন তরল ভাবে গ্রহণ করবে সীতানাথবাবু তা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই তাকে খুসি করবার জন্যে বললেন, 'যাই হোক এই ফাঁকে আড়াই টাকা লাভ হয়েছে—নতুন ঠাকুরটার মাইনে মোটে পাঁচ টাকা।'

আরো তাকে তিনি খুসি করতে পারতেন হয়তো—

কিন্তু পঁচিশ টাকা লাভের কথাটা শুধু অন্তর্যামীই জানুন।



অসিত বলিল : 'কর।'

সরযূ বলিল : 'আপনি একটা পান ত' খাবেন !'

বলিয়া পানের ডিস্‌টা অসিতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল : 'সিগারেট ?'

অসিত একটি পান মুখে দিয়া সিগারেট ধরাইল। তাহার পর, অসিতের চোখের সুমুখে চলিল উহাদের মদ্যপান ! বিলাতী মদের নেশা—ধরিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। বিজয় হাসিতে হাসিতে একবার সরযূর দিকে, একবার অসিতের দিকে তাকাইল। বলিল : 'আচ্ছা অসিত, ক'রকমের মাতাল তুই দেখেছিস ?'

অসিত হাসিল। তাহাদের দু'জনের দিকে তাকাইয়া বলিল : 'আপততিঃ দু'রকমের দেখছি।'

বিজয় বলিল : 'হাসি নয়। এই যে মেয়েটি দেখছিস্‌, মদও খেতে ছাড়বে না, আবার নেশা হ'লেই দেখবি হাউ মাউ করে' কাঁদতে বসবে !'

সরযূর বোধ হয় লজ্জা হইল। বলিল : 'কাঁদব, বেশ করব, তোমার কি ? ওর কথা শুনবেন না আপনি, ও ভারি মিথ্যে কথা বলে।'

বিজয় বলিল : 'বেশ, আমার কথা শুনো না, স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। ইনিয়ে-বিনিয়ে এখুনি কান্না সুরু হবে-আর বলবে, যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল আজ সে কোথায় ?'

কথাটা তখনও তাহার শেষ হয় নাই, এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। মনে হইল একটা মেয়ে কাহার সঙ্গে যেন ঝগড়া করিতেছে।

সরযূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল : 'সেই বুড়ো মিন্‌ষে আবার এসেছে মীরাদি'র কাছে।'

আর-কিছু বলিবার আগেই দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল সরযূর মীরাদিদি। কোমরে কাপড় জড়ানো চমৎকার মেয়েটি, ঝগড়া করিয়া আলুথালু কয়েকগাছি চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সারা দেহে যৌবনের লাবণ্য যেন ধরিয়া রাখা তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েটি বোধকরি হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সোফার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল : 'দে ত ভাই সরযূ একটা গ্লাস ! ওই লোকটার জ্বালায় আমাকে বোধহয় এ-বাড়ী ছাড়তে হবে।'

গ্লাসে মদ ঢালিয়া সরযূ তাহার হাতে দিয়া বলিল : 'আজ আবার কি বলে ?'

মীরাদি বলিল : 'সেই এক কথা ! আমি ওর ছোট ভাইটাকে নষ্ট করে' দিচ্ছি।—কিছু মনে করবেন না আপনারা।'

বলিয়াই সে হাতের গ্লাসটি কপালে ঠেকাইয়া মদটা ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি একটা পান মুখে দিয়া সিগারেট ধরাইয়া হাসিতে লাগিল। বলিল : 'মিন্‌ষে বল্‌ছে—তোমার কাছে আসা বন্ধ করবার জন্যে ভাইটার বিয়ে দিলাম। এখনও সে বৌ ছেড়ে তোমার কাছে আসছে, এর মানে কি ?—আচ্ছা বল্ ত ভাই, এর আমি কি জবাব দেবো ?'

জবাবটা সরযূরও জানা ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বিজয় জবাব দিল হাসিতে হাসিতে। বলিল : 'ছু'জনের ভালবাসা হ'য়েছে বোধ হয়।'

কথাটা শুনিবামাত্র সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে মীরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিটোল সুন্দর হাতখানি বাড়াইয়া গ্রীবা হেলাইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল : 'পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয় বন্ধু, ভালবাসা নহেকো সুলভ !'

বিজয় সরযূর মুখের পানে একবার আড়চোখে তাকাইল এবং বোধকরি তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিল : 'অথচ এইখানেই ত' শুনি ভালবাসার কথা বেশি হয়।'

মীরা বলিল : 'হবেই ত'। ওই জিনিষটি এখানে নেই যে ! যা আমাদের নেই তার কথাই ত' আমরা বেশি বলি। ওইটিই ত' মানুষের সান্ত্বনা।—আপনারা আনন্দ করুন, আমি চলি।'

এই বলিয়া মীরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল আবার তেমনি ঝড়ের মতই বাহির হইয়া গেল।

অসিত এতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া মেয়েটিকে দেখিতেছিল, এইবার সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল : 'বেশ ভাল মেয়ে।'

সরযূ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল : 'যে যত ভাল, এখানে তার তত বেশি কষ্ট।'

অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ ছুইটা বড় বড় করিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া বিজয় বলিল : 'সে কি রে ? তোরও ভাল লাগলো ?'

অসিত বলিল : 'ভাবছি, এরা কেন আসে এখানে ?'

সরযূ জবাব দিল। বলিল : 'আপনাদের বিশ্বাস করে'। ভালবাসার কাঙ্গাল হ'য়ে। আর কারও কথা জানি না। আমি শুধু আমার কথাই জানি।'

বলিতে বলিতে চোখ ছুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল, গলার আওয়াজ সহসা বন্ধ হইয়া গেল।

বিজয় বলিল : 'এই রে ! আবার আরম্ভ হলো !'

# কলঙ্কিনী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাবা তখন দেনার দায়ে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। মাত্র আট শ' টাকা দেনা। তাহাও কোনপ্রকারে যোগাড় করিতে পারিতেছেন না। দাদা সামান্য স্কুল-মাষ্টার। অসিত ছোট ভাই। দাদার কাছেই থাকে আর চাকরির চেষ্টায় এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়।

বীরভূম জেলা-ইস্কুলে একটি মাষ্টারী পাইয়া দাদা তখন সবেমাত্র বীরভূমে আসিয়াছে। অসিত বলিল : 'দাদা, আমি একবার কলকাতায় যাই। দেখি, যদি একটা চাক্‌রি-বাক্‌রি যোগাড় করতে পারি।'

দাদা বলিল : 'কলকাতায় কার কাছে যাবি ?'

অসিত বলিল : 'সেই যে বিজয়, বোলপুরে আমার সঙ্গে পড়্‌তো, মস্ত বড়লোকের ছেলে।'

তাহাই হইল।

অসিত আসিল কলিকাতায়—বন্ধু বিজয়ের কাছে। বাপের মৃত্যুর পর বিজয় তখন অনেক টাকার মালিক। চাল-চলন সবই গিয়াছে বদলাইয়া। তা যাক্। বন্ধু যখন এত বড়লোক হইয়াছে, অসিত আশা করিল, ব্যবস্থা তাহার একটা-কিছু নিশ্চয়ই হইবে।

বিজয়ের বাড়ীতে অসিতের আদর-যত্নের ত্রুটি কিছুই হইল না। বরং অতিরিক্ত আদর-যত্নে তাহার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।

অসিত বলিল : 'তাড়াতাড়ি দে ভাই একটা কিছু ব্যবস্থা করে'। আমি আর পারছি না।'

কথাটাকে বিজয় হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। বলিল : 'থাক্ না কিছুদিন। এত তাড়াতাড়ি কিসের ?'

কিন্তু কিসের যে তাড়াতাড়ি, বিজয় তাহা জানিবে কেমন করিয়া ! একদিন বড়লোকের ছেলে ছিল, আজ সে নিজে বড়লোক হইয়াছে। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বেলা দশটার সময় ঘুম হইতে ওঠে, স্নানাহার করিয়া আবার ঘুমায়, তাহার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় মোটর লইয়া একাই বাহির হইয়া যায়, ফিরিয়া যখন আসে, অসিত তখন



Numbering
Error

ঘুমাইয়া পড়ে। ভাল করিয়া কথা বলিবার সময়ও পায় না। কোনোদিন পাইবে বলিয়া মনেও হয় না।

অসিত ভাবিল, এমন করিয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই। ইহার চেয়ে দেশে গিয়া কোথাও কোনও কয়লাকুঠিতে চাকরির চেষ্টা করাই তাহার উচিত।

সেদিন তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। বিজয় দোতলা হইতে সাজিয়া-গুজিয়া নামিয়া আসিল। বাড়ীর ফটকের কাছে প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া আছে। সিঁড়ির নীচে অসিত তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল: 'আজ রাত্রে আমি চলে যাব বিজয়। তোকে দিয়ে কিছু হবে বলে' মনে হচ্ছে না।'

বিজয় লজ্জিত হইল কি-না কে জানে। হাসিয়া বলিল: 'আয় আমার সঙ্গে।'

এই বলিয়া অসিতকে তাহার পাশে বসাইয়া বিজয় মোটর ছাড়িয়া দিল।

এদিক-ওদিক অনেক ঘুরিয়া বড় রাস্তা ছাড়িয়া গাড়ী গিয়া থামিল একটা ছোট রাস্তার ধারে। তাহার পর গাড়ী হইতে নামিয়া, অসিতকে সঙ্গে লইয়া বিজয় এ বাড়ীতে গিয়া উঠিল, তাহার ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যার আসর বসিয়াছে।

অসিত বলিল: 'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলি?'

বিজয় তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

জবাব দিবার আগেই ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী একটি মেয়ে সুমুখের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অসিতের আর কিছু বলা হইল না।

বিজয় ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই পরিচয় করিয়া দিল। বলিল: 'এ আমার বাল্য-বন্ধু অসিত, আর ইনি শ্রীমতী সরযূবালা—কি বলব? দেবী, না দাসী?'

সরযূ অসিতকে একটি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয় বলিল: 'অসিত বলছে, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে?'

সরযূ বলিল: 'এ সব জায়গায় কখনও আসেননি বোধ হয়?'

অসিত বলিল: 'না।'

সরযূ আবার হাসিয়া বলিল: 'আপনারা পুরুষ মানুষ, আপনাদের জাত যাবার ভয় নেই, আপনি ভাল করে' বসুন।'

কি আর করিবে, ভাল করিয়া অসিতকে বসিতেই হইল।

বিজয়ের অধঃপতনের আর বাকি কিছুই নাই। দেখিতে দেখিতে মদ আসিল, সোডা আসিল, খাবার আসিল, পান-সিগারেট আসিল, এবং আরও কত-কি আসিল।

বিজয় বলিল: 'তুই ত' এ-সব খাবিনে অসিত। আমরা তাহ'লে আরম্ভ করি।'



বৃদ্ধ তাঁহার ঘোলাটে চোখ দুইটি তুলিয়া বলিলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ।—কি চাই আপনার?'

অসিতের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা সহজে বাহির হয় না। তাড়াতাড়ি একটা ছুতাও সে আবিষ্কার করিতে পারিল না। সোজা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: 'সরযূ বলে' কাউকে—'

কথার মাঝখানেই তিনি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন: 'সরযূ! আমার মেয়ে বাবা! কিন্তু বিজ্ঞাপন ত আর আমি দিই না। কিছুই ফল হ'লো না, দিয়ে কি করব? সেই চার-পাঁচ বছর আগে—'

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর গাদা-করা কাগজপত্রের তলা হইতে পুরানো একটা ফাইল বাহির করিয়া তিনি অসিতের হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন: 'এই দ্যাখো বাবা! বোসো বাবা বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার চোখ দুইটা একবার মুছিয়া লইলেন।

অসিত দেখিল, পুরাতন আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—সেই সরযূর একখানি ছবি, ছবির নীচে লেখা:

> ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া আমার কন্যা সরযূবালা হারাইয়া গিয়াছে। যিনি দয়া করিয়া তাহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন, তাঁহাকে নগদ একহাজার টাকা পুরস্কার দিব।

এক হাজার টাকা পুরস্কার!

অসিতের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। মাত্র আটশ' টাকা ঋণের দায়ে বাবা তাহার পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আর এখানে এই নগদ একহাজার টাকা!

অসিত জিজ্ঞাসা করিল: 'সরযূকে পেলে আপনি একহাজার টাকা এখনও দেবেন?'

শিবচন্দ্র বলিলেন: 'কেন দেবো না বাবা? এখনও দেবো।'

অসিত মাথা নত করিয়া আসন্ন সন্ধ্যার সেই স্তিমিত আলোকে বিজ্ঞাপনে-ছাপা সরযূর সেই ছবিটার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—সরযূ বাঁচিয়া আছে, এই মুহূর্তে সে-সংবাদ বৃদ্ধকে সে দিতেও পারে, সরযূ আসিতে না চায়, তাহার বাবাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাহাকে একবার দেখাইয়া দেওয়াও অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু যাহাকে তিনি একদিন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক বলিয়াই জানিতেন, তাঁহার সেই আদরিণী কন্যা আজ যদি তাঁহার চোখের সুমুখে সমাজ-পরিত্যক্তা কলঙ্কিনী বারাঙ্গনারূপে আসিয়া দাঁড়ায়, তিনি কি সুখী হইতে পারিবেন?

অসিতকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন: 'বৃথা চেষ্টা বাবা, সে আর বেঁচে নেই। আমার মনে হয়—হতভাগী লোকজনের গোলমালে সেদিন গঙ্গায় ডুবে গেছে।'

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নিষ্প্রভ দুই চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সেই ভাল। অসিত ভাবিল, বৃদ্ধ পিতার কাছে কলঙ্কিনী কন্যা তাঁহার চিরদিনের জন্য মরিয়াই থাক্, এক বাপের বুকে শেল্ হানিয়া আর এক বাপের ঋণমুক্ত হইয়া কাজ নাই। প্রাণপণে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া অসিত সেখান হইতে নীরবে সরিয়া পড়িল।

অসিতের তখনও কয়লাকুঠিতে যাওয়া হয় নাই, এমন দিনে কলিকাতা হইতে বিজয়ের একখানি পত্র আসিল।

বিজয় লিখিয়াছে : শীঘ্র চলিয়া আসিও। তোমার চাকরি ঠিক করিয়াছি।

পত্র পাইয়াই অসিত কলিকাতা রওনা হইল।

শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া গত কয়েকদিন বিজয় বাড়ীতেই বসিয়া আছে, সেদিনও সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে বাহির হইবে কি-না ভাবিতেছে, এমন সময় অসিত আসিয়া পৌছিল।

বিজয় বলিল : 'চল্, ভালই হ'লো, আজ একবার বেরোই চল্!'

আবার সেই বারাঙ্গনা-পল্লী! অসিত ভাবিল, তা হোক্, সরযূকে তাহার বাবার সংবাদটা দিতে কোনও দোষ নাই। ভাল আছেন শুনিলে সুখীই হইবে।

গাড়ীটা সরযূর বাড়ীর সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় ও অসিত দু'জনে উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাধা পড়িল। কয়েকজন কুলি একটা সোফা নামাইতেছে।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল : 'কার জিনিস?'

দরোয়ান বলিল : 'মীরা বিবির।'

সেই যে মেয়েটি সেদিন কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিয়া সরযূর ঘরে গিয়া বসিয়াছিল, অসিত দেখিল, সিঁড়ি দিয়া টলিতে টলিতে সে-ই নামিয়া আসিতেছে। বোধ হয় প্রচুর মদ্যপান করিয়াছে। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল : 'কি গো, সত্যিই চললে নাকি?'

কোনোরকমে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মীরা বলিল : 'হ্যাঁ ভাই।'

বিজয় বলিল : 'সেই-লোকটার ভাই-এর সঙ্গে প্রেম করা এখানে বোধহয় সুবিধে হচ্ছিল না। কত ছলই জানো!'

মীরার মুখে আবার সেই প্রাণ-মাতানো হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল : 'শোনো তবে, একটা কবিতা বলি—

'তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল,



সরযূ চীৎকার করিয়া উঠিল।—'তুমি থামো! তোমরা কী? তোমরা মানুষ?'

সরযূ অসিতের কাছে সরিয়া আসিল। বলিল : 'আপনারা এইখানে এলেন, আনন্দ করলেন, আবার দিব্যি বাবা-মা ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাবেন, কেউ কিছু বলবে না। আর আমরা? আমার এখনও মনে পড়ছে—বাবা মা আর ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিবেণীতে এলাম গঙ্গা নাইতে, আর-একজন এলো আমার পিছু-পিছু লুকিয়ে লুকিয়ে। ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধ করেছিলাম। তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম। হ্যাঁ, অপরাধ করেছিলাম বই-কি! কুমারী মেয়ে—জানি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে না, তবু তা'কে ভালবেসেছিলাম; অপরাধ নয়? নইলে বীরভূমের এত বড় উকিল শিবচন্দ্র গাঙ্গুলী—'

গলাটা কে যেন তাহার চাপিয়া ধরিল। চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া দু' ফোঁটা জল পড়িল।

অসিত বলিল : 'বীরভূম! আমি যে সেইখানেই থাকি!'

কথাটা শুনিয়া সরযূ চমকিয়া উঠিল। অসিতের মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল : 'আপনি বীরভূমের লোক?'

অসিত বলিল : 'হ্যাঁ।'

সরযূ আবার বিজয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া গ্লাসটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল : 'ঢালো!'

নেশার ঘোরে বিজয়ের বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চোখ খুলিয়াই গ্লাসের উপর মদ ঢালিতে ঢালিতে বলিল : 'সেই ভালো। কেন মিছেমিছি যত-সব পুরনো দিনের কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করা!' বলিয়া নিজেও একগ্লাস খাইয়া ঘুমটা ছাড়াইয়া লইয়া হাত বাড়াইয়া সরযূকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল : 'এসো!'

নিঃশব্দে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল : 'আজ আর আমার কিছু ভাল লাগছে না। তোমরা যাও।'

বিজয় বলিল : 'ধন্যি মেয়ে বাবা! চলে' যাব?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া সরযূ পাশের দরজা দিয়া ওদিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

বিজয় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, একটা সিগারেট ধরাইল, তবু যখন সরযূ ফিরিল না, তখন সে চীৎকার করিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল : 'কাল থেকে কে তোমাকে মদ খেতে দেয় তাই আমি দেখবো।'

কোনও জবাব আসিল না। বিজয় অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিল : 'চল্।'

অসিত বলিল : 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করে' আসি।'

বলিয়া সরযূ যে-পথে বারান্দায় গিয়াছিল, অসিতও সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দার এক কোণের দিকে রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া সরযূ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অসিত বলিল : 'শুনুন!'

'কে?' বলিয়া সরযূ চমকিয়া উঠিল।

অসিত জিজ্ঞাসা করিল : 'বীরভূমে কি আপনার—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই সরযূ বলিল : 'কি হবে আপনার সে-সব জেনে? আপনার কাছে বলা আমার ভাল হয়নি। খবরদার এই নিয়ে কারো কাছে যেন গল্প করবেন না।'

রাগিয়া রাগিয়া কথাগুলা সে বলিল বটে, কিন্তু অসিতের মনে হইল, আর একটা কথা বলিতে গেলেই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে।

অসিত ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

মোটরে চড়িয়া বিজয় ষ্টার্ট দিল। নেশার ঝোঁকে না রাগের মাথায় কে জানে, বিজয়ের হাত দুইটা তখন রীতিমত কাঁপিতেছে। অসিত বলিল : 'আস্তে চালা।'

বিজয় কিন্তু সে-কথায় কান দিল না। সে শুধু সারাটা পথ এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল যে, অসিতের জন্যই আজকার সন্ধ্যাটা তাহার মাটি হইয়া গেল। তাহাকে আজ সঙ্গে না আনিলেই ভাল করিত।

কাহারও সন্ধ্যা মাটি করিয়া কাজ নাই। তাহার পরের দিন সকালেই অসিত কাহাকেও কিছু না বলিয়া বীরভূম চলিয়া আসিল। এইবার সে কয়লাকুঠিতে যাইবে চাকরির সন্ধানে। তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে, হঠাৎ একদিন তাহার খেয়াল হইল—বীরভূমের বড় উকিল শিবচন্দ্র গাঙ্গুলীর সন্ধান করা যাক্।

সন্ধান পাইতে বেশি দেরি হইল না। বাজারের ও-পাশে ক্রিশ্চান-পাড়ায় তাঁহার বাড়ী। বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাই আদালতে বড়-একটা আসেন না।

সেদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে অসিত শিবচন্দ্র গাঙ্গুলীর দরজায় গিয়া হাজির হইল। জানলার কাছেই একটি টেবিল ও একটি চেয়ার পাতা। চেয়ারের উপর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কি চাই?'

অসিত বড় বিপদে পড়িল। কেন আসিয়াছে জানিতে চাহিলে কি বলিবে সে? এখান হইতে আর ফেরাও চলে না। বাধ্য হইয়া অসিত তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া বলিল : 'আপনারই নাম শিবচন্দ্র গাঙ্গুলী?'



বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝিগো আমি বুঝিগো তব ছলনা,
যে-কথা তুমি বলিতে চাও সে-কথা তুমি বলনা।'

বলিয়াই সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া গিয়া তাহারা দেখিল, সরযূর ঘরে সরযূ নাই, তাহার ঘরে অন্য মেয়ে আসিয়াছে। এ-বাড়ী হইতে দু'দিন আগে সরযূ উঠিয়া গিয়াছে।

কোথায় গিয়াছে কেহ তাহার সংবাদ দিতে পারিল না।

বিজয় বলিল : 'ভালই হয়েছে। ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়ে, চলে গেছে বেশ হয়েছে। আয়, এর ঘরেই বসি।'

অসিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল : 'কি ভাবছিস কি? আয়।'

অসিত বলিল : 'সত্যিই আমার চাকরি ঠিক করেছিস?'

বিজয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল : 'দূর বোকা! যুদ্ধুর বাজারে চাকরি পাওয়া যায়? আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খাবি-দাবি, মাসে গোটা-দশ-পনেরো টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবি। বাস্, এই ত' চাকরি!—আয় বসি, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

অসিত বলিল : 'না।'

'তার মানে?'

অসিত বলিল : 'আজই আমি বাড়ী ফিরে যাব। আমি চললাম। কিছু মনে করিসনে ভাই।' অসিত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বিজয় একবার ডাকিল : 'অসিত!' অসিতের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ফটকের কাছে অসিত দেখিল, বাঁহাত দিয়া কৌলাপ্সিব্‌ল্ গেট্‌টা ধরিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে মীরা বোধকরি গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

অসিত জিজ্ঞাসা করিল : 'সরযূ কোথায় উঠে গেছে জানেন?'

মীরা বলিল : 'পাখী যখন ওড়ে, সে ত' ঠিকানা রেখে যায় না ভাই।'

বলিয়াই সে নেশার ঝোঁকেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অসিত নামিল রাস্তায়। পশ্চাতে ওই বিচিত্রবরণী নারীর সকৌতুক কলহাস্য তখনও থামে নাই, রাস্তার দু'পাশে প্রত্যেকটি বাড়ীতে প্রমোদচঞ্চল আনন্দ-সন্ধানী যুবকযুবতীর উন্মত্ত কোলাহল, নাচের তালে তালে ঘন ঘন নূপুরের শব্দ, নারীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি,—সব-কিছু ছাপাইয়া কেন জানিনা, অসিতের শুধুই মনে হইতে লাগিল—এই আলোকোজ্জ্বল পল্লীর অন্তরালে কোথায় কোন্ অন্ধকার কোণে লুকাইয়া কোন্ এক অভাগিনী কলঙ্কিনী কন্যা সমাজ-সংসারের স্নেহবন্ধন হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিবারাত্রি শুধু গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে।

# ত্রিসীমানার গান

জীবনানন্দ দাশ

কেউ কেউ ভেবেছিল পরিদৃশ্যমান এই পরিধির
সর্ব্বদা অধীর দ্রুত কেন্দ্রের ভিতরে
হয়তো বা বিষণ্ণতা র'য়ে গেছে,—হয়তো বা সক্রিয় বিষ ;
তবু যাহা ভালো মনে হয় সেই সূর্য্যের সোনালি রশ্মি ঘরে
নেয়া যাক,—ফী বছরে অন্তত একদিন মাথায় আলোর টুপি এঁটে,
রমণীর হাত ধ'রে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে স্মরণীয় দিন যাক কেটে।
"এই তারা ভেবেছিল—কপালের ছুটো শিঙে, দ্বিখণ্ডিত খুরের মতন পায় পায়"—
ব'লে ওরা জিভ কাটে।—মানুষের রগড় কোথায় !

অন্য কেউ ভেবেছিল পৃথিবীর পুরাতন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে
হয়তো বধির হবে একদিন চোখ ;
তবুও সে সবে কিছু অন্তঃসার র'য়ে গেছে বটে।
এই ভেবে হয়ে গেল ভয়ঙ্করভাবে নিষ্পলক।
তারপর খুলে গেল আশাতীত স্নায়ুর নির্ঝর।
কেবলি বিষয় থেকে অন্বেষণ ক'রে গেছে বিষয়ান্তর।—
"ঘোলাটে নদীর জলে—কপালের ছুটো শিঙে, দ্বিখণ্ডিত খুরের মতন পায় পায়"—
ব'লে ওরা কাদা ঝাড়ে—মানুষের রগড় কোথায় !

আর কেউ ভেবেছিল—হয়তো বা অবশেষে মানুষের প্রাণে
র'য়ে গেছে কোনো এক গোপনীয় আড়।
কিংবা রোজ রাতে সব অবরুদ্ধ গৃহস্থের ঘরে
উন্মুক্ত র'য়েছে কোনো চতুর্থ বিস্তার।
পাথরের দেয়ালকে ভেদ ক'রে সেই দোর দেখা দেয় রোজ,
অথচ দেয়াল থাকে দেয়ালের মতন সহজ।
"ভেবে শূন্যে চেয়ে থাকে,—কপালের ছুটো শিঙে, দ্বিখণ্ডিত খুরের মতন পায় পায়"—
ব'লে ওরা তুড়ি দেয়।—মানুষের রগড় কোথায় !



অন্য সব ভেবে যায় : আমাদের ত্রিসীমার ভিতরে কেবল
রাত্রি হ'লে বিছানায় শোয়া যেতে পারে।
সকালে চায়ের কাপে সকলেই শ্রেণী—শ্রেণীহীন ;
পুনরায় রাত হ'লে কাপড় খ'সেছে অন্ধকারে।
আবার সকলে শ্রেণী—শ্রেণীহীন সকালবেলায় ;
পুনশ্চ কাপড় ছেড়ে রাতের ভিতরে বিছানায়
আমাদের ত্রিসীমানা ;—দ্রুত হয়ে গোল হ'ল অক্ষরেখায়।
এই ব'লে রাতদিন সরবরাহের গান গায়।

# শাদা

নিশিকান্ত

জলদের জাল পাতি রাখিয়াছে ছুর্দ্দৈব-নিষাদ
পৃথিবীর অদৃষ্ট-অম্বরে ;
সেই জাল ছিন্ন করি' মূর্ত হয় রজতের চাঁদ
পলে পলে প্রহরে প্রহরে।

আমি সে-পৃথ্বীর পান্থ, উর্দ্ধপানে তুলেছি নয়ন,
দেখি' সেই শশাঙ্ক-সুন্দরে
কোন স্বপ্নময়ী শুক্লাজননীর জ্যোতির নন্দন
করে খেলা আমার অন্তরে।

ছন্দে মোর ফুটে ওঠে পুষ্পসম সুকোমল শশি,
দীর্ণ করি' প্রলয়ের বাধা
রূপান্তরিয়া তোলে পুঞ্জীভূত কালোরে পরশি'
সে আলোর প্রকাশের শাদা।

# তবু লজ্জা পায় না দেবতা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে শুনিয়াছি দেবতার বাস
তারি নাম স্বর্গ কিম্বা তারো ঊর্দ্ধে বৈজয়ন্ত ধাম
সেকথা জানিনা মোরা, শুধু জানি বহু ভাগ্যফলে
মানুষ অশেষ পুণ্যে সেথা শূন্যে পায় নাকি স্থান।

দেবতা সেখানে নাকি বিরাজেন মাহাত্ম্যে মশগুল,
চির বসন্তের নেশা মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়ায়
নয়নে বুলায় ঘুম—নিঝুম মন্দার কুঞ্জবনে
শিথিল হইয়া পড়ে বজ্রবাহু নিশ্চিন্ত আরামে।

সেথায় উন্মুক্ত বায়ু, অনিরুদ্ধ আলোর উৎসব
মন্দাকিনী কলস্বরা, মধুমতী অমৃতবাহিনী,
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ফলে ফলে শস্যে শস্যে ভরা
অমর করেছে বীরে, অপ্রধৃষ্য তীক্ষ্ণ রণাযুধে।

শস্ত্রপাণি প্রহরীর বীরপনা ভুবনবন্দিত
স্বর্গভূমি সুরক্ষিত, দানব দৈত্যের আক্রমণ
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হয় প্রতিহত অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
সেই-সে আকাশ-পথে অবিশ্রান্ত চলে অভিযান।

অভিযান দানবের, আক্রমণ দৃপ্ত ক্ষমতার
দেবতারে তুচ্ছ করে' রাখেনাক' স্বর্গের সম্মান,
দু'হাতে ছড়ায় তারা অনিবার্য্য মৃত্যুর দম্ভোলি
পলকে প্রলয় আনে, মহাসৃষ্টি যায় রসাতলে।

নিশ্চিন্ত আলস্যে আজ শ্রুতকীর্ত্তি দেবতামণ্ডলী
বীরত্ব-বৈভব-গর্ব্ব একে একে হারালো হেলায়,



আজানুলম্বিত বাহু, স্ফীতবক্ষ, সমুন্নত মাথা
অব্যর্থ-সন্ধানী অস্ত্র, ইতিবৃত্তে রহিল সে-কথা।

আত্মসর্ব্বস্বের স্পর্দ্ধা হানা দিল স্বর্গের দুয়ারে
আকাশের বুক চিরে ছুটে চলে অগ্নি-গর্ভগোলা
লজ্জাহীন দেবতার কলঙ্কিত মহিমার গ্লানি
মানুষেরে লজ্জা দেয়, তবু লজ্জা পায় না দেবতা।

# দুঃস্বপ্ন

সমর সেন

দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে, তাই তস্কর বাড়ে ;
দুঃস্বপ্নের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে
সৌখীন সৌন্দর্য দেখি বারে বারে আসে
ধানক্ষেতে, অমসৃণ বিস্তীর্ণ বালির স্তূপে,
কখনো বা আদিগন্ত বৃষ্টির, বন্যার জলে।

ঝোড়োদিনে পোড়োবাড়ী, আলো জ্বলে অনেক দূরে।

স্থূলপদ পুরুষ, কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত নারী ;
পচা ভাদ্রের গুমোট গ্রীষ্মে অবিরল ঘাম ঝরে।
আর কিছু এ মুহূর্তে মনে পড়েনা, শুধু দেখি
কুৎসিৎ মানুষ আর রোগাক্রান্ত নারী,
বক্র, গলিতনাসা ;
উৎসবের উচ্ছিষ্ট তন্নতন্ন খুঁজে
জঞ্জালজীবী শঙ্কিত কুকুর দিনরাত্রি ঘোরে,
ছদ্মবেশী ধর্মরাজ
যেন কার শতচ্ছিন্ন শবদেহের সন্ধানে।

# আওয়াজ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শরীরে বিঁধছে শাণিত বর্ষা,
বেত চালাচ্ছে সূর্য, আর
মেঘবেষ্টিত মেদের দুর্গে
কে জাগে?—'আত্মা' বুর্জোয়ার।

ক্ষেতে ফলাচ্ছি ফসল, বুনছি
চিমনির মুখে ধূম্রজাল,
প্রাণায়াম তার বদলে মিলছে
—প্রায়োপবেশনে মৃতের হাল!

হাতুড়ি, কাস্তে গড়ে ভূস্বর্গ,
যমদূত পাশে দেয় পাহারা,
প্রজাপুঞ্জের কবরে বাঁচছে
প্রভুপদস্থ কুবের যারা।

এই দুনিয়ার চাল বদলাবো
দলবলে, কোনো লাল তারিখে
কালের লাগাম ফেরাবো আমরা
শ্রেণীহীন নবলোকের দিকে।

দিন আসন্ন, বন্দরে, গ্রামে
সংঘবদ্ধ মজুর, চাষা—
রক্তবস্ত্র নিশানে উড়ছে
বহুবাঞ্ছিত কালের আশা।

কমরেড, বেঁধে বিঁধুক বৃষ্টি,
চাবুক লাগাক সূর্য আজ,
বদ্ধমুঠিতে বজ্র তৈরী,
বিরোধী দুর্গে কুচকাওয়াজ।

# যাত্রা

হীরালাল দাশগুপ্ত

আকাশের রং হোলো লাল!
রক্তে এলো বসন্তের ঝড়!
উর্ধ্বে স্বর্গ বিরক্তির হাই তোলে:
আমাদের গানে নেই স্বর্গের স্থান—
আমাদের দেবে তুলে
স্বর্গের শিখরে শিখরে
আমাদের গান!

বার্ণিশ করো বাগান,
গালিচা বিছাও দিনের ওপর;
আর রামধনু জোয়ালের নীচে
সময়ের পিঠে লাগাও জিন!

আমাদের সোনা যেন আগুনের ঢেউ— আগুন—আগুন!
বোল্‌তার মতোন হুল্ ফুটোয় কি বন্দুকের গুলি?
গানই আমাদের অস্ত্র— গান—
গানের আঘাত সইবে এমন শক্তি আছে কার?
গতি আমাদের সারথী,
হৃদয় আমাদের গাণ্ডীব;
হে অর্জুন, ক্লীবত্ব পরিহার করো!

সোনার পিণ্ড আমাদের বজ্রকণ্ঠ;
মৃত্যু আমাদের প্রেম;
দীপ্যমান সমুদ্রে সমুদ্রে আর সৈকতে সৈকতে
আমরাই আকাশ—আমরাই অরণ্য;
লাল আলো বন্দরে বন্দরে!

পথ কাঁপে বিদ্রোহীর বন্য পদাঘাতে !
শতাব্দীর অন্ধ জানালায় বোমার মতোন ফাটে
তারার পরে তারা !
হৃদয় যেন চূর্ণ্যমান কাচের গেলাস !
প্রেম এলো আগুন নিয়ে হাতে !
আকাশের রং হোলো লাল !
রক্তে এলো বসন্তের ঝড় !

শারদীয় সংখ্যা—আশ্বিন, ১৩৪৭

**ম্যাডোনা**

( পেন্সিল ড্রয়িং )

শিল্পী—ম্যারিয়েট লীড্‌স

# রোদ

বুদ্ধদেব বসু

বারো বছর আগে, তারা সকলেই যখন কলেজের ছোক্‌রা, তখন এই সহরেই তারা দল বেঁধে হো-হো ক'রে ফিরেছে ; গুরুজনের শাসন শোনেনি, স্বাস্থ্যের নিয়ম মানেনি ; হয়তো বেরিয়ে পড়েছে বেলা এগারোটাতেই, উস্‌কোখুস্‌কো চুল, পায়ে স্যাণ্ডেল, রেল-লাইন পার হ'য়েই চাটগেঁয়ে চায়ের দোকান, সেখানে, চা, কচ্ছপের ডিম আর সিগারেটের টিন নিয়ে একটা বাজিয়েছে ; ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে তিন মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরেছে ; একবার টিকাটুলিতে সুনীলদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে ঠিক পল্টনের মাঠের মধ্যে নামলো বৃষ্টি, তারা দাঁড়ালো না, ঘাবড়ালো না, গতি তাদের একটুও দ্রুত কি মন্থর হ'লো না, ঠিক যেমন হাঁটছিলো তেমনি হৈ-হৈ করতে-করতে গন্তব্যে এসে পৌছলো, খুব যে একচোট ভিজতে পেরেছে, আজকের মতো সেটাই চরম ফুর্তি।

গন্তব্য অবশ্য সুরথেরই বাড়ী। মাঠের মধ্যে একটি টিনের ঘরে সুরথ তার বিধবা মা-র সঙ্গে থাকতো, সেই ঘরেই ছিলো আড্ডাটির কেন্দ্র। এতদিনে সে-ঘরটির অতি জীর্ণ চেহারা হয়েছে, এখন সেখানে পাড়ার মেয়ে-ইস্কুল বসে। ঘরটি সুরথের চোখে পড়লে তার মনে হয় : 'ইস্‌—এখানে কেমন ক'রে ছিলুম! আগাগোড়া টিন—কী সাংঘাতিক গরম! বাপ্‌স্‌!'

কিন্তু ঐ ঘরে ছ'টি বছর, ছ'টি গ্রীষ্ম সে কাটিয়েছে, তার মধ্যে একটি দিনও গরমে কষ্ট পেয়েছে ব'লে মনে করতে পারে না। ছেলেবয়েসে কি আর বোধচৈতন্য থাকে!

এমন কোনো ঋতু নেই, দিন-রাত্রির এমন কোনো সময় নেই, যখন ঐ ঘরটিতে তাদের বিচিত্র দলটি একত্র না হয়েছে ; তাদের মধ্যে কেউ কারো মতো নয়, কিন্তু সকলেই ফুর্তিবাজ, বেপরোয়া ; অপরিমিত চা, অগুনতি সিগারেট, আর অফুরন্ত গল্প, কখনো উদ্দাম হাসি, প্রগল্‌ভ ঠাট্টা, কখনো বা গম্ভীর ও করুণ হৃদয়-উদ্ঘাটন। একবার তো সারা-রাত জেগে রবি ঠাকুরের 'পূরবী' (তখন সদ্য-প্রকাশিত) পড়া হ'লো—সকলেরই ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু কেউ সে-কথা স্বীকার করেনি।

আষাঢ়ের সেই সকাল বেলায়, যখন সবুজ মাঠ কখনো আলোয় উজ্জ্বল, কখনো ছায়ায় স্নিগ্ধ, আর থেকে-থেকে হাওয়ার ঝাপ্‌টা শাদা আর ছাইরঙের মেঘগুলোকে আকাশ ভ'রে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে, সুরথের হঠাৎ এ-সব কথা মনে পড়লো। ঠিক যে সব

কথা মনে পড়লো তা নয় ; ঘুম থেকে উঠে সে তার বড়ো মেয়ের হাত ধ'রে বাগানে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ ভিজে ঘাসের একটি মধুর তীব্র গন্ধে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো, মনে হ'লো যেন সেই দিনেই সে ফিরে এসেছে যখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর বেলায় ফাঁকা মাঠের মধ্যি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে হো-হো ক'রে ফিরেছে।

এবার এই শহরে সে আছে প্রায় ছ'মাস, গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি সে এখানেই কাটালো, কিন্তু এ-রকম অনুভূতি আজকেই তার প্রথম। কলকাতায় সে আছে তাও প্রায় দশ বছর হ'তে চললো, এখানকার সঙ্গে সমস্ত বন্ধনই তার ছিন্ন, আর তার স্ত্রী যদি এই শহরেরই মেয়ে না হ'তো, তাহ'লে এখানে হয়তো সে আর কখনোই ফিরতো না। স্ত্রীর উপলক্ষ্যে বছরে একবার এখানে আসতেই হয়, কোনো-না-কোনো ছুটি শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে যায়। কলকাতার হট্টগোলের পর এখানে তার ভালোই লাগে, কিন্তু সে-ভালো লাগার মধ্যে পুরোনো দিনের স্মৃতির কোনো আন্দোলন নেই, কখনো তার মনে হয় না তারই পুরোনো জায়গায় সে ফিরে এসেছে, যেমন সে মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে নানা যায়গায় বেড়াতে যায়, এ-ও তেমনি। এখানে চারদিক চুপচাপ, বাড়িটি নিরিবিলি, হু-হু হাওয়ার বিরাম নেই ; এখানে পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, সবুজ ঘাস বৃষ্টিতে বেড়ে ওঠে, এখানে সূর্যাস্তের সময় আকাশের পূবে আর পশ্চিমে ছ'রকমের রঙের খেলা পাশাপাশি চলতে থাকে—এ সবই ভাল লাগে সুরথের। ভালো লাগে, কিন্তু কখনো মনে হয় না সে এখানকারই। রমনার নির্জন, সুন্দর রাস্তাগুলি দিয়ে যখন হাঁটে এ-কথা কখনো মনে হয় না যে এই তার প্রথম যৌবনের লীলাভূমি, এই সব রাস্তা দিয়েই সে রোজ কলেজে গেছে, কলেজ থেকে ফিরেছে, বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করতে-করতে বেড়িয়েছে, অস্ফুটস্বরে লাগসই কোটেশন বিড়বিড় করতে-করতে পরীক্ষার আগে হল্‌-এর সামনে পায়চারি করেছে, তাও এখানেই, রোদে বর্ষায় জ্যোছনায় এই ঘাস, এই শুকনো কি পচা পাতা পড়েছে তার পায়ের নিচে, এই সব চোরকাঁটার পূর্বপুরুষেরাই বিঁধেছে তার কাপড়ে। যদি বা মনে পড়ে, তাতে কোনো আবেগের ছোঁয়া লাগে না। তার মনের নির্লিপ্ততায় সে নিজেই একটু অবাক না হয়ে পারে না। আর এখানকার গাছপালা, পথঘাট, বাড়িঘর—এরাও উদাসীন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে কাছে ডাকে না, তাকে দাবি করে না, একদিন যে সে এদেরই মধ্যে নিতান্তই এদের একজন ছিলো, তার কোনো চিহ্নই এরা রাখেনি। মনে হয় যেন এ-শহর রংপুর কি সিলেট কি পাটনা হ'তে পারতো—সুরথের পক্ষে তাতে কিছুই তফাৎ হ'তো না। এখানে যে সে আগন্তুক তা সে-ও যতটা জানে, সবুজ মাঠ-চেরা ছাইরঙের সরু রাস্তাগুলোও তার চেয়ে কম জানে না।



অন্য জায়গার সঙ্গে এখানকার একটু যা তফাৎ, যা, সত্যি বলতে, সুরথের পক্ষে একটা আকর্ষণ, তা এই যে সেই আদি দলটির ছ'একজন এখনো এখানেই রয়েছে। যে-কলেজে তারা ছাত্র ছিলো, এখন সেখানেই তারা শিক্ষক। তাদের সময়কার অধ্যাপকরা এখনো প্রায় সকলেই রয়েছেন, কিন্তু কুড়ি বছর পরে এই বিদ্যালয়ে এমন একজন শিক্ষকও হয়তো থাকবেন না, যিনি তাদের পড়িয়েছেন। এখনো তারা অল্প বেতনের বয়োকনিষ্ঠের দলে, কিন্তু পনেরো কি কুড়ি বছর পরে দেখা যাবে তারা অধিনায়কদের শিবিরে জায়গা ক'রে নিয়েছে, আর তখনো যদি সুরথের গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে আসতে হয়, তাহ'লে বন্ধুদের দেখা পেতে হ'লে তাকে যেতে হবে রমনার এক-একটি প্রাসাদে, কিংবা গিয়েও দেখা পাবে না, কারণ কেউ তখন কাশ্মীরে, কেউ বা উটিতে।

জীবনে আমাদের যে-পরিবর্তন হয় তা এমনি তুচ্ছ। আমরা ছোটো বাড়ি থেকে বড়ো বাড়িতে যাই, বছরে ছ'খানার বদলে চব্বিশখানা ধুতি কিনি, পুত্রকন্যার সংখ্যা বাড়ে, স্ত্রীরা মোটা হন, আর-কিছু না। আর-কিছু হয় না। জীবনে যেটা সব চেয়ে প্রধান সেটা কবে হারিয়ে ফেলেছি মনেও নেই, তা আর ফিরে পাবো না।

২

হঠাৎ ঘাসের গন্ধে সুরথের মনে হ'লো, পেয়েছি, ফিরে পেয়েছি। রোদে বৃষ্টিতে হৈ-হৈ ক'রে বেড়িয়েছে, হঠাৎ অসময়ে বন্ধুরা এসে হাজির হয়েছে, পাটি-ফেলা খাটে ব'সে উরুর উপর কনুই রেখে আড্ডা, আকাশে কখনো মেঘ কখনো রোদ, বিস্তীর্ণ ঘাসে কখনো বৃষ্টির আক্র, কখনো হলদে কি গোলাপি আলো, হাতে এত সময় যে সময় নষ্ট হবার ভয় নেই—এ যেন তারই একটি দিন। সুরথ ঠিক ক'রে ফেললো অনুপমের বাড়ি যাবে, এখনই, চা খেয়ে নিয়েই। অনুপমের সঙ্গে রোজই প্রায় দেখা হয়, কিন্তু সন্ধেবেলায় ; সকালবেলার আড্ডার যে একটি বিশেষ স্বাদ আছে তার জন্যে সে লুব্ধ হ'য়ে উঠলো।

জামা প'রে সে চুল আঁচড়াচ্ছে, তার স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাও যাচ্ছো নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'অনুপমদের বাড়ি।'

,তোমার না আজ বিকেলে যাবার কথা ?'

'যাই এখনই।'

লিলি বাইরের দিকে একটু তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললে, 'যা রোদ! একটা গাড়ি নিয়ে যাও।'

'না—না—গাড়ি লাগবে না। হেঁটেই যাবো,' ব'লে সুরথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

লিলি তার পিছনে ডেকে বললে, 'ফেরবার সময় গাড়িতে এসো কিন্তু।'

সুরথ কিছু বললে না, মনে-মনে হাসলো। গাড়ি সে করবে না, ফেরবার সময়ও নয়। একটা কাঠের বাক্সে সে উঠে বসবে, আর দুটো মুমূর্ষু ঘোড়া অতি অনিচ্ছায় তাকে টেনে নিয়ে যাবে, কথাটা ভাবতেই আজ তার অত্যন্ত হাসি পেলো। আজ সমস্ত পৃথিবীই তাকে বাইরে ডাকছে। বাইরে, আকাশের তলায়, অবারিত হাওয়ার ঝাপটায়, ঘাসের গন্ধে, আকাশের, মেঘের রঙে। কী সুন্দর পৃথিবী আমাদের! চোখ, নাক, কান, আর আমাদের এই শরীরের চামড়া—এরই ভিতর দিয়ে সমস্তটা পৃথিবী আমাদের রক্তে মজ্জায় মিশে যেতে চায়—কেন আমরা দূরে ঠেলে রাখি, সরিয়ে দিই? রমনার রাস্তায় দ্রুত, লঘু পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুরথের মনে হ'লো এত ভালো তার শিগ্‌গির লাগেনি, একটি নিটোল উজ্জ্বল সুখ যেন অযাচিত করুণায় এইমাত্র তার বুকের মধ্যে নামলো। এই সুখের কারণ কী? কিছুই না—আকাশের তলায়, হাওয়ার ঝাপ্‌টায় সে হেঁটে চলেছে বন্ধুর বাড়ি, আশে-পাশে পাখি ডাকছে, সবুজ ঘাসে হলদে রোদ ঝিল্‌মিল্‌ করছে, আর মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়ায় তার সামনেকার অনেকখানি পথ ধূসর হ'য়ে যাচ্ছে, যদিও পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড লম্বা বাড়িটা রোদে উদ্ভাসিত।

অনুপমদের বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে এক মাইলের কিছু উপরে। আদ্ধেক রাস্তার বেশি সুরথ যেন এক নিঃশ্বাসে চ'লে এলো, তারপর রাস্তার একটা বাঁক ফিরতেই হঠাৎ একেবারে চোখের উপরে এসে পড়লো দৃষ্টি-অন্ধ-করা সূর্য, অনেকক্ষণ মেঘের ছায়া পড়লো না, সুরথের নিচের জামাটা ঘামে ভিজে উঠলো, কিন্তু এক্ষুনি পৌঁছিয়ে যাবে, এই আশ্বাস তাকে ক্লান্তিবোধ করতে দিলে না। একখানা হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে সে আরো একটু তাড়াতাড়ি পা চালালো, তাতে ঘাম ঝরলো বেশি, নিঃশ্বাস ভারি হ'লো, কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই সে অনুপমের কলিং বেল টিপলো।

অনুপম তাকে দেখে মহা খুসি।—'আমি ভাবছিলাম তুমি এখন এলে চমৎকার হয়। কিন্তু সত্যি যে আসবে তা অবিশ্যি আশা করিনি।'



মিনিটখানেক সুরথ কিছু বলতে পারলে না; বাইরের আলোর বন্যা থেকে এসে ঘরের মধ্যে সে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিলো না, কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছিলো, নিঃশ্বাস পড়ছিলো জোরে। অনুপম পাখা খুলে দিলে, বাইরে থেকে হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে পাখার হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

সুরথ বললে, 'পাখার দরকার নেই।'

অনুপম বললে, 'ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও।'

ঠাণ্ডা হ'তে দেরি হ'লো না, সুদৃশ্য সেটে চা এলো, দেখতে-দেখতে এগারোটা বাজলো।

সুরথ বললে, 'এখন উঠি।'

অনুপম বললে, 'আর-একটু বোসো।'

সুরথ চেয়ারে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললে, 'তোমাদের সঙ্গে যে ক্ষিতীশ চাটুয্যে পড়তো সে আজকাল কী করছে?'

সাড়ে-এগারোটা বাজলো। সুরথ আবার বললে, 'এখন উঠতেই হয়।'

কিন্তু সে উঠলো যখন, তখন বারোটা বেজে গেছে। অনুপম বললে, 'একটা গাড়ি আনিয়ে দিই।'

সুরথ খুব একটা ফুর্তির সুরে বললে, 'গাড়ি লাগবে না। হেঁটেই চ'লে যাবো।'

'বলো কী! এই রোদ্দুরে! বোসো একটু, গাড়ি আনিয়ে দিচ্ছি।'

সুরথ একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললে, 'আজকের রোদ্দুরটি ভারি চমৎকার। এই মেঘ, এই রোদ।'

অনুপম বললে, 'ভারি গরম।'

'না, না, গরম কোথায়!' সুরথ তীব্র প্রতিবাদ করলে। 'সারাদিন কী হাওয়া! আর আকাশ কী নীল, দেখেছো!'

গাড়ি সুরথ কিছুতেই নিলে না, মনের মধ্যে একটা অহেতুক, অযৌক্তিক ফুর্তির গুনগুনানি নিয়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লো। দুপুর বেলার হাওয়ায় গাছের পাতায়-পাতায় শোঁ-শোঁ, মরমর শব্দ, পাখিদের চ্যাঁচামেচি থেমে গেছে, কিন্তু কোথায় একটা নিঃসঙ্গ, অক্লান্ত পাখি থেকে-থেকে ডেকে উঠছে। আকাশ যেখানে মেঘমুক্ত সেখানে অসহ্য নীল, একদিকে কালো মেঘের মাথায় রূপালি আগুন জ্বালা। প্রতি ঋতুতে, প্রতি দিনে ও রাত্রিতে পৃথিবী ও আকাশের রঙ্গমঞ্চে কত সৌন্দর্যের জন্ম ও মৃত্যু, ভাবতে বুক ভ'রে ওঠে, বুক ভেঙে যেতে চায়।

খানিক দূর হেঁটে সুরথ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো, যদি একটা গাড়ির দেখা মেলে। হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে গরমে শরীর যেন তার জ্বালা করতে লাগলো। একটা বট গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরালো—কী আশ্চর্য নীল আজকের আকাশ। কিন্তু এখানে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও যে গাড়ি পাওয়া যাবে এমন আশা নেই। যতদূর দেখা যায় রাস্তায় সে-ই একমাত্র যাত্রী। সমস্ত পাড়াটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের, এখন ছুটির সময় হস্টেলগুলো শূন্য, রাস্তায় লোক চলাচল বিশেষ নেই, বিশেষ এই দুপুর বেলায়···

গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিয়ে সে আবার রওনা হ'লো। কী অসম্ভব ঘামছে সে। সিগারেটটা বিশ্রী লাগছে, দিলে ফেলে। পিচ্‌-বাঁধানো রাস্তা নির্মম রোদে মড়ার মতো প'ড়ে আছে—এখনো কতটা রাস্তা তাকে যেতে হবে। গাড়ি একটা নিলেই পারতো।

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সারা গায়ে আলপিন ফুটতে লাগলো, চুলের গোড়া পর্যন্ত ঘামে ভিজে গেলো, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বিরক্ত হ'য়ে সে রুমাল পকেটেই ভ'রে রাখলো—দেখি, কত ঘামতে পারে। বাড়ির কাছাকাছি এসে তার মনে হ'লো এতখানি কায়িক শ্রম জীবনে সে কখনো করেনি। আর বাড়ি পৌঁছতে লিলি যখন জিজ্ঞেস করলে, 'এত দেরি করলে যে?', তখন তার স্নাত, প্রশান্ত, ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে চেহারাটি দেখে সুরথের এমন প্রচণ্ড রাগ হ'লো যে পাছে কথার জবার দিতে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর কিছু ব'লে ফ্যালে সে-ভয়ে সে কোনো কথাই বললে না, ধুমধাম ক'রে উপরে উঠে জামাটা একটানে গা থেকে খুলে চিৎপাৎ হ'য়ে খাটের উপর শুয়ে পড়লো।

# সহরতলী

—দ্বিতীয় খণ্ড—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

বাড়ী ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক্‌ হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা উদয় হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়ের চোখে, তাই কি ঠিক? অন্য আর কি হইতে পারে? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু'চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তার তো অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়? কিন্তু সত্যপ্রিয়ের পক্ষে কি ওটা সম্ভব? বিশেষতঃ তাকে দেখিয়া? তাঁর মত বিরাটকায়া মাঝবয়সী রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়ের মত প্রৌঢ় মানুষের মধ্যে জোয়ারের আকস্মিক বন্যার মত প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে, এ তো বিশ্বাস করার মত কথা নয়।

চোখ বুজিয়া বাস্তবকে এড়ানোর ছেলেমানুষী যশোদার মধ্যে নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়ের মত সবল সুস্থ দেহ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে বলিয়াই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছাসের অসংযমকে একেবারে বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামায়ণ মহাভারতে যশোদা মুনিঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনী পড়িয়াছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী মেয়েরা। যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুণ্ডাও যে ভড়কাইয়া যায়!

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভাল করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়ই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর। সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এরকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না,—তার মত হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখার কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস,—কিন্তু তাও যেন তার ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বলতা, জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে একটু খেয়াল খেলার সুযোগ দেওয়া।

অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল ?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। সহরতলীর উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ীর উপর দিয়া নূতন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ী আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে। বাড়ী বিক্রয় করার বিরুদ্ধে আর নির্দ্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে যশোদার যদি কিছু বলিবার থাকে, নির্দ্দিষ্ট একটি দিনের মধ্যে যশোদা যেন তার লিখিত আবেদন দাখিল করে।

ইংরাজীতে লেখা নোটিশ, যামিনী তাকে সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়া মানে বুঝাইয়া দিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া যশোদা বলিল, 'বাড়ী বেচতে হবে ?'

যামিনী বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি! আপত্তির কথাটা বাজে, ওরা আপত্তি কানে তোলে না।'

'আমি বেচতে না চাইলেও বেচতে হবে ?'

'তাই তো আইন—রাস্তার জন্য কিনা! তবে ওরা দাম ভাল দেয়—এখানকার বাড়ী বেচে অন্য জায়গায় বাড়ী করবেন।'

যশোদা বিশ্বাস করিল না। নোটিশ-হাতে পাড়ার রমেশ উকিলের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। ফিরিয়া আসিয়া ছাখে, কেদার বসিয়া আছে।

'কি ব্যাপার চাঁদের-মা ?'

'আবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

আগে আর কখনো যশোদা পাততাড়ি গুটায় নাই, কেবল গুটানোর উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয়, পাততাড়ি গুটাইয়া গুটাইয়াই যেন তার জীবন কাটিয়াছে।

কেদার হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দেখি, প'ড়ে দেখি একবারটি কি লিখেছে।'

'এর মধ্যে খবর পেয়েছ ?' বলিয়া যশোদা নোটিশটি তার হাতে দিল। গম্ভীরভাবে নোটিশ পড়িয়া নিরুপায় আপশোষের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঃ! ওই গব্‌দানাচনের কাজ আর কি!'



যশোদারও কথাটা মনে হইয়াছিল, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় নাই। সহর আর সহরতলীর উন্নতির জন্য যারা মাথা ঘামায়, তাদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়ের সম্পর্কই বা কোথায় ? তাছাড়া, ক'দিন আগে সত্যপ্রিয়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাও যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না।

কেদার আবার বলিল, 'মেয়েজামাইকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ কিনা, তার শোধ তুলল।'

সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল, যোগমায়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল, 'আমাদের কথা বলছ তুমি! বাবার কথা বলছ! আমার বাবাকে তুমি গব্‌দানাচন বললে ?'

কেদার বলিল, 'শুধু গবদানাচন ? তোমার বাবা—'

যশোদা বলিল, 'আহাঃ, থামো না বাপু, তোমারও কি মাথা খারাপ হ'ল ?'

এখানে আর বেশী সহানুভূতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যোগমায়া কাঁদিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল।

যশোদা বলিল, 'কিন্তু চক্কোত্তি মশায়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি ?'

কেদার বলিল, 'সম্পর্ক আর কি, ও-ব্যাটার কোম্পানী থেকে এ-পাড়ার সব ঘরবাড়ী জমিজমা কিনে নিয়েছে তো, তুমি আর আমি শুধু বেচিনি। তারপর ব'লে দিয়েছে, এখান দিয়ে রাস্তা গেলে সুবিধা হবে।'

'তুমি আর আমি যদি বলি এখান দিয়ে রাস্তা যেতে দেব না ? একটু তফাৎ দিয়ে—?'

কেদার মাথা নাড়িল, 'আমরা দু'জন বললে কি হবে, সবাই বললে তবু ভরসা ছিল। তা সবাই তো আগেই ঘরবাড়ী বেচে ব'সে আছে।'

যোগমায়ার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সত্যপ্রিয়ের ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার কথাটা যশোদা তাদের শোনায় নাই। আপনা হইতে এরা যদি ফিরিয়া যায়, আর গিয়া ছাখে যে, সত্যপ্রিয় একটুও রাগ করে নাই, দু'জনেই খুব খুসী হইবে। ভাবিয়াছিল, নিজেই বুঝাইয়া দু'জনকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে।

কেদার কাজে চলিয়া গেলে যশোদা যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি তো চললাম, আপনারা এবার কি করবেন ?'

যামিনী ইতিমধ্যে একবার ঘরে গিয়া বাপের অপমানে অপমানিতা যোগমায়ার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, 'তাই ভাবছি।'

'ফিরেই যান না ?'

'তাই যাই, কি বলেন ?'

'সেই ভাল। আমার মনে হয়, চক্কোত্তি মশায় রাগ করেন নি, আপনারা ফিরে গেলে খুব খুসী হবেন।'

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'ফিরেই যদি যেতে হয়, দেরী করা বোধ হয় উচিত হবে না। যেতে হ'লে আজকেই চ'লে যাই। আপনি কি বলেন ?'

'তাই যান।'

অজিতের দিকে চাহিয়া যশোদা হাসিয়া বলিল, 'তোমরা কি করবে ভাই ?'

অজিত বলিল, 'এই তো সবে নোটিশ এলো, এখনও ঢের দেরী। বাড়ী বেচে সব ঠিকঠাক ক'রে উঠে যেতে বছরখানেক তো অন্ততঃ লাগবেই—ইচ্ছে করলে বেশীও লাগাতে পারেন। আমরা কি করব, ভেবেচিন্তে ঠিক করলেই হবে।'

যশোদা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, 'দেরী নেই ভাই, দু'চার দিনের মধ্যে আমি উঠে যাব, যত শীগ্‌গির পারি। এখানে আর মন টি'কছে না। দু'দিন বাদে উঠে যেতেই হবে ভাবব আর দিন গুণে দিন কাটাব—বাপ্‌রে, আমার দম আটকে আসবে।'

'আমরা তবে অন্য কোথাও ঠিক করে—'

সুব্রতার কথার উৎস অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়া ছিল, চোখ দু'টি একটু যেন ছলছল করিতেছিল। অজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলিয়া উঠিল, 'অন্য কোথাও না ছাই, আমরাও দিদির সঙ্গে যাব। তোমায় আর আমি ছাড়ছি না দিদি, ম'রে গেলেও না—যেখানেই যাও তুমি আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব। হুঁ, বলে এতকাল পরে সত্যিকারের একটা দিদি পেলাম, দিদি যাবে এক যাগায়, আমরা যাব আর এক যাগায়! কি যে বল তুমি!'

অজিত তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমি এমনি বলছিলাম।'

সুব্রতার গালটা একটু টিপিয়া দিয়া যশোদা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ছোট ছোট দু'টি উনানে রান্না হইতেছে, একটি তোলা উনান। আগে একবার যখন যশোদার ভরাট রাড়ি খালি হইয়া গিয়াছিল, চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বড় বড় উনানগুলি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই উনানগুলিও আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কোথায় যাইবে? কোথাও বাড়ী কিনিয়া উঠিয়া যাইবে, না নন্দের বাড়ীতে গিয়া উঠিবে? কেদার নন্দের ঠিকানা আনিয়াছে, নন্দ নাকি এখন বড়লোক, তার বসিবার ঘরে গদি-আঁটা চেয়ার। সেখানে কি থাকিতে পারিবে যশোদা? কিন্তু যেখানেই যাক, উনানগুলি আবার তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

( সমাপ্ত )

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭ বেলতলা রোড, কলিকাতা

# বিশ্বসাহিত্য ও নোবেল প্রাইজ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১৯৩৯ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ফ্রান্স এমিল সিলানপা। ইনি ফিনল্যাণ্ডের লোক এবং ঔপন্যাসিক। যে সময় ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তার ভৌগলিক অস্তিত্ব যখন আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় তার একজন সাহিত্যব্রতী নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আমরা ফিনল্যাণ্ডের জন্যে সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়েই ছিলাম—সেই সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়েই সম্প্রতি তাঁর দু'খানা বই পড়লাম—Meek Heritage আর Fallen Asleep While Young. বলা বাহুল্য বই দু'খানি ভালোই লেগেছে—নাগরিক সভ্যতাদৃপ্ত ইউরোপের সাহিত্যে পল্লীবাসী কৃষক ও দরিদ্র গৃহস্থের রূপ বড় একটা দেখা যায় না। অন্যতম নোবেল লরিয়েট রেমণ্ট এবং সিলানপাই বোধ করি এদিক থেকে এ যুগে কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু রেমণ্টের সঙ্গে সিলানপার তুলনা হয় না—রেমণ্ট অনেক উঁচুদরের লিখিয়ে। তাঁর সাহিত্যে সেই সুগভীর জীবনবাণীর নির্দেশ আছে, যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য। সিলানপার লেখা বেশ ঝরঝরে, বেশ মিষ্টি—কিন্তু সেই বুদ্ধির দীপ্তি ও দৃষ্টির সূক্ষ্মতা তাঁতে নেই, যা ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তব আবরণকে ছাপিয়ে পাঠককে গভীরের পানে আকর্ষণ করে।

তাই বার বার মনে হতে লাগলো যে, বিপন্ন ফিনল্যাণ্ডকে আন্তর্জাতিক ভাবে সমবেদনা জানাবার জন্যেই বোধ হয় তার একজন সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে—নইলে সিলানপার মতো সাধারণ সাহিত্যিক কি করে' এই পুরস্কার পান? আমি আগেই বলেছি যে, সিলানপা ভালো লেখক—কিন্তু ভালো লেখক আর বড় লেখকে তফাৎ আছে। সিলানপা বড় লেখক নন, তাঁর সমান লেখক সব দেশেই, সব সাহিত্যেই আছেন রাশি রাশি—লোকে তাঁদের রচনা আগ্রহ করে' পড়ে, পড়ে' আনন্দও পায়, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের আসরে তাঁদের কোন স্থান নির্দেশ করতে যায় না। অবশ্য একথাও বলে' রাখা দরকার যে, নোবেল পুরস্কার যাঁকেই দেওয়া হয়েছে, তিনিই বড় সাহিত্যিক নন—বরং অনেক বড়কে বাদ দিয়ে অনেক ছোটকেই এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সে হিসাবে সিলানপার পুরস্কার-

প্রাপ্তিতে অসঙ্গত কিছুই হয়নি। অনেক বারের মতো আর একবার অবাক হয়েছি—এই মাত্র।

১৯০১ সাল থেকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে আসা হচ্ছে—মধ্যে দু' একবার শুধু ফাঁক গিয়েছে—এই সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর ইউরোপ আমেরিকার অনেক সাহিত্যিকই এই পুরস্কার পেয়েছেন, ভারতবর্ষকেও একবার দিয়ে বুড়ী ছুঁয়ে রাখা হয়েছে—কিন্তু এই দীর্ঘ তালিকায় এমন ক'টি নাম পাই, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে যাঁদের দান অতুলনীয় বলে' গণ্য হবার যোগ্য ? এক নিঃশ্বাসে বলে' যেতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রলাঁ, আঁরি বার্গসঁ, আর বড় জোর থিওডোর মমসেন, জর্জ্জ বার্ণার্ড্শ'। তাও এঁদের মধ্যে বার্গসঁ দার্শনিক এবং মমসেন ঐতিহাসিক—সাহিত্য বলতে সাধারণ ভাবে আমরা যা বুঝি, এঁরা তা রচনা করেন নি। এঁদের পরে ফেলতে পারি, মরিস মেটারলিঙ্ক, জেসিণ্ডো বেনাভাঁতে, ফ্রেডরিক মিস্ত্রাল এবং হেনরিয়ক সিনকোয়েভিচকে—যাঁরা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু তারপর ? রাডিয়ার্ড কিপলিং, ন্যুট হামসুন, কার্ল স্পিটেলার, কার্ল জেলারূপ, বিয়ার্ণ ষ্টার্ণ বিয়ার্ণসেন, গ্রাৎসিয়া ডেলেড্ডা, সিগ্রিদ উন্দসেৎ···এঁরা কেউই বড় লেখক বলে' নোবেল প্রাইজ পাননি, নোবেল প্রাইজ পেয়েই বড় লেখক হয়েছেন্।

[ ২ ]

রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ বা আনাতোল ফ্রাঁস যে শ্রেণীর সাহিত্যিক, সে শ্রেণীতে স্থান পাবার মতো সাহিত্যিক অবশ্য কোন দেশেই দলে দলে জন্মাতে পারেন না। কিন্তু যে ব্যাপারে অনেককে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়, সেখানে পরস্পরের ভেতর কোথাও না কোথাও এক ধরণের সমধর্ম্মিতা আছে বলেই আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু রলাঁর পাশে হামসুন, রবীন্দ্রনাথের পাশে স্পিটেলার, আনাতোল ফ্রাঁসের পাশে কিপলিংকে বসানোর সত্যিই কোন সমর্থন আছে ? ওঁরা কি এক জাতের না এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য ? একথা অবশ্যই ঠিক যে, মিস্ত্রালের চাষী-জীবনের কবিতাগুলি বেশ মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী, বিয়র্ণসনের নাটকগুলি বেশ তীক্ষ্ণ এবং সরস, হামসুনের উপন্যাসগুলি বাস্তবতার স্পর্শে বেশ সজীব, কিপলিং-এর গল্প বা কবিতাগুলি বেশ কৌতুকপ্রদ এবং সুখপাঠ্য···কিন্তু জাঁ ক্রিস্তফ, কিংবা Crime of Sylvester Bonnard, কিংবা গীতাঞ্জলি এই সুলভ রসসৃষ্টির অনেক উর্দ্ধে—এত উর্দ্ধে যে, এঁরা ততদূর পৌছুতেই পারেন না। সাধারণ ভাবে এঁরা সকলেই সুলেখক, কিন্তু অসাধারণ কেউই নন, আর সেই জন্যেই এঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যা, তা সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার মাশুল নিয়েই শেষ হয়ে যাবে, পরে আর কিছুই থাকবে না। গলস-



ওয়ার্দ্দি, ইয়েটস, শ', সেলমা লেগারলফ বা টমাস ম্যান এঁদের হিসাবে অনেক বড়—তাঁদের মননশীলতা, জীবন ও জগত সম্বন্ধে দৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্তদের কাছাকাছি যায়।

কথা উঠবে হয়ত যে, পুরস্কারটা প্রতি বৎসর দিতে হয়, কিন্তু প্রতি বৎসরই ত আর এক একটা দিকপাল সাহিত্যিক পাওয়া যায় না, সুতরাং ওরই মধ্যে বাছাই করে' দিতে হয় এবং অপক্ষপাত বিতরণ করতে হয় বলে', এক দেশের বড় লেখককে ছেড়েই আর এক দেশের ছোট লেখককেও কৌলীন্য দিতে হয়। নোবেল কমিটির সেক্রেটারী লিওনার্ড ডালই একবার এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটা কথার কথা মাত্র—অপক্ষপাত বিতরণ যে হয় না তার প্রমাণ, এই পুরস্কারকে গত চল্লিশ বৎসর কাল শুধু ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা রয়েছে—এশিয়ায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি স্বয়ং ইংরেজীতে রচনার অনুবাদ করে' ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যিক-সমাজ তাঁকে বিধিমতো ভাবে প্রচার করেছিলেন, নইলে তাঁর লেখা যদি শুধু বাংলাতেই আবদ্ধ থাকতো, তাহ'লে এত বড় মনীষী হয়েও তিনি এ পুরস্কার পেতেন না। যেমন পাননি আরব কবি খলিল জিব্রান, বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, উর্দ্দু সাহিত্যিক ইকবাল···এঁদের মধ্যে জিব্রান লিখেছেন ইংরেজীতেই, শরৎচন্দ্রের অন্ততঃ তিনখানা বইয়ের অনুবাদ হয়েছে শুধু ইংরেজীতে নয়, ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষায় এবং রলাঁ তাঁর প্রশংসাও করেছেন—ইকবালের কবিতা এবং দার্শনিক রচনাও বেশীর ভাগই ইংরেজীতে সুলভ। যতদূর জানি, এঁদের রচনা নোবেল কমিটির নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত হয়ে পরীক্ষার্থ গিয়েও ছিল, কিন্তু ফল হয়নি। যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ভেতর এঁরা যে অনায়াসেই স্থান পেতে পারতেন, বরং অনেকের ওপরেই পেতেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন—অথচ কেন এঁরা পেলেন না ?

এছাড়া চীন আছে, জাপান আছে, মিশর আছে, তুরস্ক আছে। সে সব দেশেও বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আছেন প্রচুর। জাপানের সাহিত্য ত ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ সমাদরই পেয়েছে। নোগুচি এবং কোমাই-এর কবিতা, কিনকুচির নাটক, সাকোয়ের উপন্যাস ইংরেজীতেই পড়েছি এবং যদিও আমার বিশ্বাস তা এমন কিছুই নয়, তবু অপক্ষপাত বিতরণের কথা উঠলে অপরাপর লরিয়েটের তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্মানে এঁদেরও দাবী এসে পড়ে বৈকি !

সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য মন্থন করে, সব দেশের প্রতি সমদর্শিতা রক্ষা করে যে প্রাইজ বিতরণ হয় না, ওটা যে শ্বেতজাতির মধ্যেই যথাসম্ভব আটকে রাখ-

রার চেষ্টা হয়ে থাকে, একথা স্বীকার করতেই হবে। বলা অনাবশ্যক যে, এই নিয়ে আমাদের নালিশ নিষ্ফল—কৃষ্ণ ও পীত জাতির সম্বন্ধে শ্বেতজাতির সর্ব্বক্ষেত্রেই অবিবেচনা, এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম না হওয়াই বোধ হয় ভালো।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে, ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও এই প্রাইজ বিতরণে যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি ও সমদর্শিতা অবলম্বিত হয় না। নোবেল প্রাইজের জন্মকালে ইংলণ্ডের সাহিত্যে ছিলেন হার্ডি, মেরিডিথ, সুইনবার্ণ, লরেন্স—তাঁদের ভেতর যোগ্যতম মনে করা হ'ল কিপলিংকে, যিনি Barrackroom Ballads এবং Jungle Book লিখে প্রসিদ্ধ। যিনি টেস বা ইমিগ্রান্ট লিখেছেন, যিনি ইগোয়িষ্ট লিখেছেন, যিনি লিখেছেন এটল্যাণ্টা এণ্ড ক্যালিডন এবং সেক্সপিয়ার ও ভিক্টরহুগোর ওপর জগৎবিখ্যাত সমালোচনা, যিনি লিখেছেন লেডী চ্যাটার্লীজ ল্যভার এবং প্যানসির প্রসিদ্ধ কবিতামালা, তাঁরা হলেন উপেক্ষিত, আর সাপ্তাহিক পত্রিকার পপ্যুলার লেখক কিপলিং হলেন বিশ্বসাহিত্যের আসরে সমাদৃত! ফ্রান্সেও ভার্লেন, ভেয়ারহারেন, মালার্মে ছিলেন, বোধ করি বদলেয়ারও ছিলেন—অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের জন্মদাতা যাঁরা, তাঁদের ভেতর থেকে বেছে নেয়া হ'ল তত্ত্বকথার কবি স্যুলি প্রুধোঁকে এবং চাষী-জীবনের ( বার্ণসের অনুগামী ? ) কবি মিস্ত্রালকে! নরওয়েতে ছিলেন ইবসেন এবং এখনো আছেন জোহান বোয়ের—তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য হ'ল। যে ইবসেন পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্যে বিপর্য্যয় এনেছেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ হন, বেনাভাঁতে হন, পিরেন্দেল্লো হন, শ' হন, সিঞ্জ হন, সকলেই যাঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁকে বাদ দিয়ে বিয়র্ণসনকে যোগ্যতর বিবেচনা করা হ'ল। ( অথচ বিয়র্ণসনের লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে ইবসেন থেকেই তিনিও বস্তুতান্ত্রিক নাটকের উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। ) হাঙ্গার লেখক হামসুন, গ্রেট হাঙ্গার লেখককে টপ্‌কে গেলেন বিনা কারণেই। ইটালীতে কার্দ্দুচিকে প্রাইজ দেওয়া হ'ল, ডোনানজিও বাদ পলেন—জার্ম্মানিতে পল হেস্থে পেলেন, জেরার্ট হাউংম্যান পেলেন, কিন্তু হারম্যান জুডারম্যানের কথা উঠলো না! আমেরিকায় সিনক্লেয়ার লিউইস পুরস্কৃত হলেন, কিন্তু আপ্টন সিনক্লেয়ার, যিনি ব্যাবিট রচয়িতার চেয়ে অনেক বড় লেখক, তাঁর কথা বিবেচিত হ'ল না—ইলিয়ট এবং কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, এযুগের কাব্য-সাহিত্যে যাঁদের প্রভাব সার্ব্বভৌম হতে চলেছে, তাঁদের নামও শোনা গেল না। সাধারণ নাট্যকার ইউজেন ওনেলকে করা হ'ল সম্মানিত।

তবু রাশিয়ার কথা তুলিই নি। শুনেছি, রাশিয়া নাকি নিজে থেকেই এই প্রাইজ নিতে অস্বীকৃত। তাই বোধ হয় নিরপেক্ষতার ভাণটা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য



আধুনিক রাশিয়ার সাহিত্যিকদের তুলনায় দুর্ব্বলতম লেখক আইভান বুনিনকে একবার এই পুরস্কার দিয়ে দেয়া হ'ল। টলষ্টয় থেকে সুরু করে' মাইকেল সোলোগব পর্য্যন্ত রুশ-সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, যার মধ্যে আছেন চেকভ, আন্দ্রিভ, কুপরিণ, গোর্কী, তার ভেতর Gentleman from Sanfrancisco বা Well of Days লেখকের স্থান কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্ভূত এবং ধনতান্ত্রিক ইউরোপে অবস্থিত বলেই বুনিনকে যোগ্যতার মার্কা দেয়া হয়েছে, প্রতিভার জন্যে নয়,—ডষ্টয়েভেস্কী, টুর্গেনিভ, গোগোলের দেশে তাঁকে প্রতিভা বলবার লোক উনবিংশ শতাব্দীতেও কেউ ছিল কিনা সন্দেহ!

[ ৩ ]

এ পর্য্যন্ত যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু' জন দার্শনিক—ইউকেন আর বার্গসঁ, আর একজন ঐতিহাসিক—মমসেন। বাকী সকলেই কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নয়ত ছোটগল্প লেখক। তাঁদের মধ্যে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পান মাত্র তিন চার জন—অবশিষ্টেরা ভাগাভাগি করে' নেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী। আমারও বিশ্বাস তৃতীয় শ্রেণীতে ভীড় নিতান্ত কম নয়—কিপলিং, সিলানপা, হিডেনষ্টাম, এগজেল, পণ্টোপিডান, জালারুপ, ডেলেড্ডা, উন্দসেং—এঁরা সবই তৃতীয় শ্রেণীর। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেই এঁদের সমকক্ষ লেখক প্রচুর আছেন—নিতান্ত বাংলা বলেই আমরা তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেও আবার শক্তির তারতম্য আছে—সিনকোয়েভিচ, ইচেগ্যারে, রেমণ্ট, বেনাভাঁতে, মেটারলিঙ্ক সবাই পড়েছেন, এঁদের একাধিক রচনা অসাধারণ না হয়েও ক্ল্যাসিকের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এঁদের পাশে কার্দ্দুচি, স্পিটেলার বা হুগারকে আমার ত নিতান্তই ম্লান মনে হয়। কার্দ্দুচির প্রাইমোভেরা কাব্য, স্পিটেলারের অলিম্পিয়ান স্প্রিং কাব্য এবং হুগারের থিবো উপন্যাস হালে অনুবাদ হয়েছে—পড়ে' হতাশ হয়েছি বলেই একথা বলছি। সত্যিকার বড় দৃষ্টি, মহৎ অনুভূতি বা বিরাট পরিপ্রেক্ষণী—যা টলষ্টয়ে, রবীন্দ্রনাথে, আনাতোল ফ্রাঁসে, র'লাঁয়, এমনি কি গ্যালসওয়ার্দ্দিতেও পাই, এঁরা তার ধার দিয়েও যান নি। আবার যে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষুরধার ঔজ্জ্বল্য শ', ইবসেন, লরেন্স ইত্যাদিতে পেয়েছি—তাও এঁদের লেখায় নেই। এঁরা সাধারণ রোমাণ্টিক লেখক।

পরাধীন এবং অনগ্রসর দেশ আমাদের। ইউরোপের নামেই আমরা ভক্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠি—তাই তার কাক-বক সকলকেই আমরা মনে করি নমস্য। নোবেল

প্রাইজের ছাপ দিয়ে যে সমস্ত সাহিত্যিককে ছুনিয়ার পথে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের সকলকেই তাই আমরা পীর-পয়গম্বর মনে করে' বসছি। বস্তুতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ত বটেই, খাস ইউরোপেই অ-নোবেলীকৃত সাহিত্যরথী অনেক ছিলেন, আছেন—এ কথা আমরা যেন না ভুলি। বার্গসঁ এবং ইউকেন সম্মানিত হয়েছেন বলে' দার্শনিক-রূপে ক্রোচে, বোসাঙ্কে, হোয়াইট হেড বা রাসেল তাঁদের চেয়ে ছোট নন—মমসেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে' ঐতিহাসিক রূপে জারিঞ্জভ, ট্রট্স্কি, ল্যেম্যান, লুডভিগের আসন এক চুল নীচে নয়—টম্যাস মান বা সিনক্লেয়ার লিউইস নোবেল প্রাইজে ভূষিত হয়েছেন বলেই উপন্যাসে অলডাস হাক্সলি, ফর্ষ্টার, প্রিষ্টল্যে বা আপ্টন সিনক্লেয়ারের হাত কিছু কম নয়—একথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একটা দেশের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের খেয়ালখুসী মতো বেছে বেছে যে সম্মান বিতরণ করে—তা নিরপেক্ষ নয়, সার্ব্বভৌম নয়, সর্ব্বক্ষেত্রে যোগ্য পাত্রে ন্যস্তও হয় না। অর্থাৎ নোবেল প্রাইজের অর্থ মূল্য যথেষ্ট হলেও, সাংস্কৃতিক মূল্য অবিচার ও অপ-বিচারের দোষে আজ একদম নষ্ট হয়ে গেছে।

[ ৪ ]

আমাদের সমালোচকরা ইদানীং বিশ্ব-সাহিত্য কথাটি একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন—যে কোন রকমের বইকেই তাঁরা বিশ্ব-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলে' মতপ্রকাশ করে থাকেন। এ জন্য অবশ্য তাঁদের দোষ দিতে পারিনে—নির্ব্বিচারে নোবেল প্রাইজ বিতরণ করে অনেক অতি সাধারণ শ্রেণীর লেখককে বিশ্ব-সাহিত্যিকের স্তরে উন্নীত করে ইউরোপই প্রথম বিশ্বসাহিত্যের Standard নামিয়ে এনেছেন। ইউরোপের গুণগরিমায় হৃতদৃষ্টি আমরা আজ ঐ নিরিখেই বিচার করি, তাই আমাদের কাছেও বিশ্ব কথাটা কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিশ্ব কথাটা ছোট হলেও, জিনিষটা ছোট নয়—তার সাহিত্যও নেহাৎ অল্প নয়। কত সভ্যতার উত্থান হয়েছে, কত নূতন নূতন দৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি যুগে যুগে মানুষকে দেশে দেশে করেছে সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ—প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে কত প্রতিভার উদ্ভব হয়েছে, কত মহা রচনার অবিনশ্বর আলোকে হয়েছে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বলীকৃত। এই সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের সংস্কৃতি—এই হ'ল বিশ্ব-সাহিত্য, এর কতটুকুর খবর রাখি আমরা?

# ধর্ম্মঘট

বিমল মিত্র

রামলোচন দে'র গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিলেই ট্রাম। ট্রামে চড়িয়া আসা যায়—আবার হাঁটিয়াও আসা যায়। হাঁটিলে চারিটা পয়সা বাঁচে। পয়সা বাঁচাইবার দিকেই অনন্তর লক্ষ্যটা বেশী। রোজ হাঁটিয়াই চলে—সুতরাং ট্রামে উঠিবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আজ তার মনে হইল—পয়সা থাকিলে বেশ হয়; অনেক পয়সা, আরাম করিয়া ট্রামে গেলে বেশ হয়। এদিক ওদিক চাহিয়া, লোকের ধাক্কা খাইয়া চলিবার দরকার নাই। অনন্তর যদি অনেক পয়সা থাকিত অনন্ত ট্রামে চাপিয়া বাড়ী যাইত—রোজ—রোজ!

অনন্তর বাড়ী আসিবার যে সংক্ষিপ্ত রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়াই সে আসে; তিনটি গলি পার হইয়া, ছুইটি বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া তাহাকে বাড়ী আসিতে হয়—অনেকটা দূর।

নন্দবাবু বলিয়াছিল—পান খান না অনন্তবাবু?

শুধু পানই নয়—অনন্ত কিছুই খায় না, বিড়ি নয়, সিগারেট নয়। শেষকালে নেশা হইয়া যাক্—তারপর তাহার খরচ জোগাইতেই সর্ব্বস্বান্ত। কাজ কি ওসব বদঅভ্যাসে। হিসাব করিয়া চলিলে এক টাকায় ছ'দিন চলিয়া যায়।

অনন্ত নীচের ক্লাশের ছেলেদের পড়ায়; উপরের ক্লাশে যাহারা পড়ায় তাহারা বি-এ, এম-এ, পাশ; তবু যা' হোক্—সেকালে চাকুরী পাইয়াছিল তাই রক্ষা—আজকাল হইলে এণ্ট্রান্স পাশকে কেই বা চাকুরী দিত।

স্ত্রীকে অনন্ত বলিয়া আসিয়াছিল—বাসা আমি কলকাতায় করবোই—এই দেখে নিও। তারপর আজ দশবছর কাটিয়া গিয়াছে—হোটেলে খাইয়া আর নিয়মিতভাবে দেশে টাকা পাঠাইয়াই খালাস। বাসা করা অনন্তর আর ঘটিয়া ওঠে নাই।

ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে ছেলেরা যখন অঙ্ক কষিতে সুরু করে—জানালার বাহিরে সুদূর দিগন্তের দিকে নজর পড়িতেই অনন্ত কেমন উদাস হইয়া যায়। ছাদের পর ছাদ—ছাদের যেন তরঙ্গ চলিয়াছে। কলিকাতা সহরের কেন্দ্র—কোথাও কোন বাড়ীর বারান্দায় একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া রৌদ্রে চুল শুকাইতেছে—একটা চিল ঊর্দ্ধ আকাশে বৃত্তাকারে উড়িয়া বেড়ায়—সহরের দ্বিপ্রহরে কখন অজ্ঞাতে এই সব কল-

কোলাহল অতিক্রম করিয়া অনন্ত তাহার দেশের ছোট বাড়ীটিতে গিয়া পদার্পণ করিয়াছে।

—দেখে আয় তো খুকী—বড় বাগানে কে আম পাড়ছে—

অনন্ত এখানে বসিয়াই সরমার গলা শুনিতে পায়।

খুকী বড় হইয়াছে। দুপুরবেলা পাড়ার ছেলেরা চুরি করিয়া আম পাড়িতে আসে। খুকী দেখিয়া আসিয়া হাত ঘুরাইয়া বলে—কেউ না—

সরমার সব দিকে নজর। বর্ষাকালে একটু রোদ উঠিল তো যত বড়ির হাঁড়ি, আচারের জার শুকাইতে দিতে হইবে। যে-জিনিষটি সরমা না দেখে তাহাই নষ্ট! এতটুকু বিশ্রাম তাহার নাই। খাটিতে খাটিতে প্রাণান্ত হইবে—মুখে বলিবে—আর পারিনে, মরণ হলেই বাঁচি—কিন্তু কে যে তাহাকে অত পরিশ্রম করিতে বলে। বকিবারও কেহ নাই—আদেশ পালন করিবার মত দশটা মানুষও তাহার অধীনে নাই—শুধু অভ্যাস আর সংসারের উপর অপার মমতা।

কিন্তু অনন্তর মনে হয় এত মমতা লইয়াও সরমার সংসার করিবার সৌভাগ্য হইল না। স্বামী রহিল বিদেশে—একলা বউ-মানুষটি পড়িয়া রহিল দেশে। অনন্তর মনে হয়, আর যদি কিছু বেশী আয় থাকিত সরমাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিত নিশ্চয়ই।

রাস্তা দিয়া মটর চলিয়া যায়—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া—বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেরা মায়ের হাত ধরিয়া খেলা করে—অফিস হইতে স্বামী আসিবার আগে বউরা সজ্জা-প্রসাধন করিতে থাকে—চোখ থাকিলে এ-সমস্ত সকলেরই নজরে পড়ে! অনন্ত ছাতিটা হাতে লইয়া চলিতে চলিতে ভাবে: মিথ্যা—সব মিথ্যা—টাকা না থাকিলে বাঁচিয়া থাকাটাও বুঝি মিথ্যা!

রবিবার দিন ছাতিটা লইয়া বিকালের দিকে অনন্ত বাহির হইল।

অনেক দিন আগে যখন প্রথম অনন্ত কলিকাতায় আসে, সেই সময়ে মল্লিক-বাবুদের বাড়ীর ছেলেকে পড়াইবার চাকরী পাইয়াছিল। বিরাট বড়লোক—অমন পাঁচ সাতখানা বাড়ী—তিন চারখানা গাড়ী—লোক জন—চাকর দারোয়ানের ছড়াছড়ি। কেমন করিয়া মাষ্টারী যে অনন্ত পাইয়াছিল ওখানে সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু কেন জানি না নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই অমন চাকরী মেলে। চাকর-বাকর দারোয়ান দেউড়ী পার হইয়া অনন্ত পড়াইতে যাইত। টুকটুকে ছেলে। পড়িত কিম্বা পড়ার নাম করিয়া অর্থ নষ্ট করিত। দশখানা বই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও দশ পাতা পর্য্যন্ত আগাইত না। যাহারা পড়িবে না তাহাদের পড়ানো পণ্ডশ্রম, কিন্তু তা' হোক্—মাহিনা মিলিত ঠিক মাসের পয়লা দিন।



সে কথা এখন চন্দ্রনাথের মনে আছে কি না কে জানে।

হাজার হোক্ অর্থবান লোক, তাহাদের একটু খোসামোদ করিলে কী-ই বা আসে যায়। বড়লোকের ছেলে—লেখাপড়া তাহাদের পক্ষে বিলাসিতা। অথচ টাকা থাকিলে—সামর্থ্য থাকিলে অনন্ত আজ বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া কলেজের প্রফেসারীই তো করিতে পারিত। ছেলেটি দুষ্টামি করিত বটে কিন্তু মাষ্টারকে ভালওবাসিত খুব। বিকালবেলা মাষ্টার মশাই না হইলে বেড়ানো হইত না। সেই চন্দ্রনাথ আজ বড় হইয়াছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় চলিতে চলিতে দেখা হয় বটে। মটরে করিয়া যায়! এখন মোটা হইয়াছে অনেক—তা' হোক্—মোটা হইলে বড়লোকদের ভালই দেখায়। গাড়ীটা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, সোনার চেনের সহিত মিনে-করা বোতামগুলি আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর ঝক্ ঝক্ করিয়া ওঠে। হাজার বড়লোক হোক্—অনন্তরই তো ছাত্র। ছাত্রের গর্ব্বে অনন্ত নিজেও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল।

সাধ্যমত অনন্ত সুশ্রী হইয়া লইয়াছে। ফরসা একটা সার্টের উপর কোট চড়াইয়া অনন্ত অনেকখানি সম্ভ্রান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরই বাড়ীটা।

অত্যন্ত সন্তর্পণে গেটের কাছে যাইতেই দরোয়ান পথ আট্‌কাইল।—কা'কে চাই?

অনন্ত বলিল—খোকাবাবুকে। তারপর ভুল শোধরাইয়া বলিল, চন্দ্রনাথবাবুকে—

নতুন দরোয়ান, এরা অনন্তকে চেনে না। চন্দ্রনাথ আজ বাবু হইয়াছে, এখন হয়ত কেউ খোকা বলিয়া ডাকে না। বাপ নাই—এখন ছেলেরাই সম্পত্তির মালিক।

নাম-ধাম লইয়া দরোয়ান ভিতরে বাবুকে খবর দিতে গেল। আসিয়া বলিল—বাবু এখনই বেড়াতে বেরুবেন, একটু অপেক্ষা করুন—এখানেই দেখা হবে—

অনন্তর মনে হইল, যা'ক্, তাহা হইলে চিনিতে পারিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট। বছর কুড়ি বাইশ দেখা নাই—ভাবিয়াছিল দেখাই করিবে না। দেখা তো করিতে চাহিয়াছে। দেখা না করিতে চাহিলেও কিছু বলিবার থাকিত না। চারিদিকে বাগান—মাঝখানে লাল সুরকীর রাস্তা—ঝক্‌ঝকে একখানা মটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ যেন এক অন্য জগৎ।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—চন্দ্রনাথের দেখা নাই। বিরাট বাড়ী—কে কোথায় থাকে—বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই। সময় যাইতেছে—অনন্ত দোদুল্যমান চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল সমস্ত ভাবিয়া ফেলিল। যদি টুইশানিটা পাওয়া যায়—সরমাকে এবার নিশ্চয়ই কলিকাতায় আনিবে। খুকীকে এখানকারই স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিবে।

একদল লোক আসিতেছিল। বন্ধুবান্ধব লইয়া চন্দ্রনাথকে আসিতে দেখা গেল। অনন্ত আগাইয়া যাইতেই চন্দ্রনাথ যেন চিনিতে পারিয়াছে এই ভাবে অনন্তর দিকে চাহিল। অনন্তর মনে হইল—মাষ্টার হইয়া আগে নমস্কার করা কি উচিত? কিন্তু তখন ভাবিবার আর সময় কোথায়।

বন্ধুরা সিগারেট খাইতেছিল। মটরে গিয়া সবাই উঠিল।

অনন্ত কাছে যাইতেই চন্দ্রনাথ যেন সিগ্রেটটা একটু আড়াল করিয়া বলিল—ও আপনি—তা' এখন তো আমি বেরুচ্ছি—তা'—

অনন্তর গলা দিয়া বাহির হইল—একটা মাষ্টারি যদি—বাবা—করে' দিতে তোমাদের বাড়ীতে—

—আচ্ছা কাল সকালে একবার আসবেন—তখন কথা হবে—

মটর চলিয়া গেল। অনন্তর নাকে পেট্রলের আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ আসিল। চন্দ্রনাথ যখন কথা দিয়াছে তখন নিশ্চয়ই হইবে। যাক্—তবু তো তাহাকে দেখিয়া সিগ্রেটটা একটু আড়াল করিয়াছিল—চোখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেই বা অনন্ত কী বলিত।

অনন্তর মনে হইল: ভগবান নিশ্চয়ই আছে। মাসে পঁচিশ টাকা মাহিনায় চন্দ্রনাথের ছেলের মাষ্টার নিযুক্ত হইল। এক কথায়! কথা বাড়াইবার লোক চন্দ্রনাথ নয়। ছোটবেলা হইতেই অনন্ত তাহাকে চেনে—বড় হইয়া—অনন্তর মনে হইল—চন্দ্রনাথ এতটুকু বদলায় নাই!

অনন্তর নতুন ছাত্র চন্দ্রনাথেরই মত দেখিতে। তেমনি দুষ্ট হইয়াছে। বছর বারো বয়স হইবে কিন্তু বদমায়েসীতে ওস্তাদ। এতদিন বাড়ীতেই পড়িতেছিল। অনন্ত তাহার নিজেরই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

চন্দ্রনাথ বলিল—ভালোই হোল—আপনি নিজে একটু কেয়ার নিয়ে পড়াবেন—আমাদের তো কিছুই হোল না—

অনন্তর আয় আরো পঁচিশ টাকা বাড়িল। এবার সরমাকে কলিকাতায় আনিবে। ছোট্ট একটি সম্পূর্ণ বাড়ী—এমন করিয়া সংসার করিবার সাধ সরমার আর অনন্তর বহুদিনের।

আরো দশজনের মত কলিকাতা সহরের ভিতর সংসার করা—এ যেন বহু ভাগ্য থাকিলে তবেই হয়। অনন্তর যেন নিজেকেও ঈর্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। সরমাকে চিঠি লিখিয়া দিল—একটা সুবিধা মত বাড়ী খোঁজা হইতেছে—এই মাসের মাহিনাটা



পাইলেই সকলকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে। নিজে যদি অনন্ত না-ও যাইতে পারে, ওখানকার মতিকাকাকে বলিবে সকলকে লইয়া আসিতে—তাহার যাবতীয় খরচ দিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

একটি মাস যেন আর কাটিতে চায় না। সরমার চিঠি আসিয়াছে—সে সব জিনিয়-পত্র গোছাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল অনন্তর চিঠির অপেক্ষা। অনন্ত যেন অতি অবশ্য করিয়া দেশে যাইবার চেষ্টা করে একবার।

ইস্কুলটা চৌধুরীবাবুদের। বাগবাজারের চৌধুরী বংশ। সখ করিয়া ইহারা ইস্কুল করিয়াছিলেন—এখন সেই ইস্কুল এত বড় হইয়াছে। সরস্বতী পূজার সময় এই ইস্কুলই ধুমধাম করিয়া সহর মাতাইয়া দেয়।

চন্দ্রনাথের ছেলে মণিকান্ত ক্লাশ এইটের ছাত্র—কিন্তু সমস্ত ছেলের দলের পাণ্ডা। গাড়ী করিয়া আসে—ছুটিতে দু'টাকা করিয়া দরোয়ানদের বখশিস্ দেয়।

একমাস কাটিয়া গেল। সরমাদের আর আনা হয় না। দেখিতে দেখিতে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যায়। শেষে নন্দবাবু একটা বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন।—বাড়ীটা অনন্তর পছন্দ হইয়া গেল।

চৌধুরীবাবুদের ইস্কুলে অনন্ত চাকরী করে—মল্লিকবাবুদের বাড়ীর মাষ্টার। এ যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার! এমন করিয়া যদি দিন চলে তবে আর অনন্তর ভাবনা নাই। নিজের অবস্থাকে অনন্ত এখন সচ্ছল বলিয়া ভাবে।

ভাদ্র মাসটা বাড়ী হইতে বাহির হইতে নাই। আশ্বিন মাসের দোসরা তারিখে সরমারা আসিবে। বাড়ী ভাড়ার কিছু টাকা একদিন বায়না দিয়া দিল অনন্ত।

কিন্তু বিপদ যে কখন কোথায় কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, কে জানে!

একদিন স্কুলে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন দুপুর দু'টার সময় টিফিনের ছুটির ঘণ্টায় ভীষণ সোরগোল উঠিল। অঙ্কের মাষ্টার বঙ্কুবাবুকে হঠাৎ সিঁড়ির তলায় রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা গেল। কে নাকি তাঁহাকে ঠেলিয়া দোতলার সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দিয়াছে! মাষ্টাররা যে যেখানে ছিলেন ছুটিয়া আসিলেন—হেডমাষ্টার আসিলেন—ছাত্ররা আসিল—ভীড় আর সোরগোলের অন্ত নাই! শেষে খবরটা পৌঁছিল স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে—অর্থাৎ চৌধুরীবাবুদের বাড়ী। বাগবাজারের চৌধুরী-বংশ!

গাড়ী করিয়া ছুটিয়া আসিলেন সেক্রেটারী। বঙ্কুবাবুকে হাসপাতালে পাঠানো হইল। অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই।

অনন্তবাবু নিজেই হাসপাতালে গেলেন। ইস্কুল ছুটি হইয়া গেল। রাস্তায় চলিতে চলিতে অনন্তর মনে হইল—সব যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। চৌধুরীবাবুদের তো সে চেনে। কী কাণ্ড ঘটে কে জানে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া অনন্ত যেন বঙ্কুবাবুর সেই রক্তাপ্লুত শরীরটা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। বাঁচিবে কি না কে জানে। যদি না বাঁচে! স্কুলের ছেলেদের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবে! স্কুল দু'তিন দিন বন্ধ রহিল। চৌধুরীবাবু নিজ হাতে তদন্তের ভার লইয়াছেন! ভাবিয়া ভাবিয়া অনন্তর সারা রাত ঘুম হয় না। সরমারা আসিয়া পড়িলে যেন সে বাঁচে! তাহাদের মুখ দেখিলে তাহার যেন শান্তি হয়। কবে যে দোস্‌রা আশ্বিন আসিবে! নতুন বাড়ীটাতে গিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট্‌—রান্নাঘর সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। একটা উনুন পর্য্যন্ত পাতিয়া ফেলিয়াছে!

স্কুল কমিটির মিটিং হইল। মিটিং-এ ঠিক হইল—ঠিক আর কী হইবে—ধরা কেহ পড়ে নাই—সন্দেহ যাঁহাদের করা হইতেছে, তাহাদের স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে!

চন্দ্রনাথের কাছেও চিঠি আসিল—মণিকান্তকে তাহারা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। অপরাধী ছেলেদের দলে সেও ছিল—সে-ই ছেলেদের পাণ্ডা! সেক্রেটারীর নিজের সই—চৌধুরীবাবুর নিজের চিঠি! বাগবাজারের চৌধুরী-বংশ! অনন্ত দিশাহারা হইয়া চন্দ্রনাথের কাছে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তখন আর কী হইবে। যা' হইবার হইয়া গিয়াছে!

চন্দ্রনাথ রাগিয়া আগুন! বাগবাজারের চৌধুরী-বংশের কাছে মল্লিকবাবুরা হার মানিবে! কখনও নয়! চন্দ্রনাথ রাগিয়া বলিল—এ শুধু আপনার জন্যেই হোল মাষ্টার মশাই—এ অপমান আপনার জন্যেই সইতে হোল—আপনিই ওকে চৌধুরীদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিলেন—রাগে আর তাহার কথা বাহির হইল না!...

বিরাট গোঁফওয়ালা ম্যানেজার মশাই দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন—আপনি এখন স'রে যান্ মাষ্টার মশাই—দেখছেন না বাবু রেগে গেছেন—

অনন্ত চলিয়া আসিল।

কিন্তু স্কুল যেদিন প্রথম খুলিল, দেখা গেল ছেলেরা সদলবলে ষ্ট্রাইক করিয়াছে। শুধু তাই নয়—গেটে দাঁড়াইয়া একদল ছেলে পিকেটিং করিতেছে। কেহ স্কুলে যাইবে না, এবং কাহাকে যাইতেও দিবে না।

যে-ক'জন ছেলেকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে হইবে, তবেই আবার সকলে স্কুলে ঢুকিবে! পুরাদমে ষ্ট্রাইক চলিল। ছেলেরা গেটের সামনে চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল। যদি যাইতে হয় সকলকে ডিঙাইয়া শরীর মাড়াইয়া লাথি মারিয়া যাও! মাষ্টারেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিল।



মণিকান্ত একবার মটরে আসিয়া সকলকে উৎসাহ দিয়া গেল। বলিয়া গেল—কেউ এতটুকু নড়ো না, দেখি ইস্কুল কী করে' চলে—

এক দিন—দুই দিন—

এমনি করিয়া তিন দিনের দিন স্কুলের সেক্রেটারী টেলিফোনে পুলিশ ডাকিয়া আনিলেন। তারপর সে এক প্রলয় কাণ্ড! কাহার হাত, কাহার পা ভাঙিল—কেহ ঠিক রাখিল না। অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা আসিয়া যোগ দিল। সহরময় হৈ চৈ—খবরের কাগজের স্তম্ভে বড় বড় করিয়া সংবাদ ছাপা হইল। ছেলেরা পার্কে গিয়া মিটিং করিল। মণিকান্ত বক্তৃতা দিল—আরো অনেকে দিল। ধর্ম্মঘট চলিবে—যতদিন না অন্যায়ের প্রতিকার হয়! চৌধুরী-বংশের জেদ বেশী বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়! পুঁজিবাদের ধ্বংস চাই! ছেলেরা গরম হইয়া উঠিল। হয় ছেলেদের সর্ত্তমত আপোষ করিতে হইবে নচেৎ দলে দলে সমস্ত ছেলেরা অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইবে।

সেদিন লোক পাঠাইয়া চন্দ্রনাথ অনন্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অনন্ত হঠাৎ ডাক পাইয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। কী সংবাদ শুনিতে হইবে কে জানে!

বিরাট গোঁফওয়ালা ম্যানেজার মশাই দাঁড়াইয়া ছিলেন—মণিকান্তও দাঁড়াইয়া ছিল—অনন্ত গিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—মাষ্টার মশাই যা' হোয়ে গেছে হো'য়ে গেছে—ঠিক করেছি চৌধুরীদের ইস্কুলে আমাদের বাড়ীর ছেলের পড়া অপমানের বিষয়—আমি নিজেই ইস্কুল করবো—যত টাকা লাগে আমি দেব—আপনি গিয়ে আপনাদের সেক্রেটারীকে বলে' আসুন—মুখের ওপর বলে' আসুন—

অনন্ত কী আর বলিবে, শুধু বলিল—আমি চৌধুরীবাবুকে সেই কথাই বলবো—সে তো খুব ভাল কথা—তোমাদের বংশের সঙ্গে ওদের তুলনা—

চন্দ্রনাথ বলিল—আমি ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করেছি—তিনি এখনি এসে পড়ছেন—আমার শ্যামবাজারের মোড়ের জমিতেই ইস্কুল তৈরী হবে—আপাততঃ আমার চোরবাগানের বাড়ীতে ইস্কুল বসুক—যত শিগ্‌গির হয় আরম্ভ করতে হবে—আপনাকে এর ভার নিতে হবে!...

ম্যানেজার মশাই বলিলেন—তবে আর দাঁড়িয়ে কেন মাষ্টার মশাই, যান্—সব ব্যবস্থা করে' ফেলুন—

অনন্ত চলিয়া আসিল। ভালই হইয়াছে। এ যেন শাপে বর হইল। অনন্ত সরমাকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছে। বাড়ী ঠিক হইয়াই গিয়াছে আগে। দোস্‌রা আশ্বিন যেন মতিকাকার সঙ্গে তাহারা আসে। অনন্ত ষ্টেশনে থাকিবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক। অনন্ত এতদিন পরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

রাত্রে শুইয়া শুইয়া অনন্ত অপরূপ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রির—স্বপ্ন দেখে অনাবিল আনন্দের—স্বপ্ন দেখে নিঃসীম নীলিমার! বঙ্কুবাবু এখনও হাসপাতালে, দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতেছে। সেদিন অনন্ত বঙ্কুবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। বঙ্কুবাবু বলিলেন—আমার চাক্‌রীটা আছে তো ভাই?

অনন্ত বুঝিতে পারে না কেন এমন হয়!—কেন উদ্যত খড়্গ নিরপরাধের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। যে দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্র দায়ী নয় কেন তা'কে ধনীরা ঘৃণা করে! অনন্ত আজকাল অনেক কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে।

মণিকান্তকে পড়াইতে আসিয়া সেদিন অনন্ত হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল: চৌধুরী বাবুদের গাড়ী চন্দ্রনাথের দেউড়ীতে। দেখিল—সেক্রেটারীর ম্যানেজার গাড়ী হইতে নামিল এবং গোঁফওয়ালা ম্যানেজার মশাই তাহাকেই অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন!

শুধু সেইদিনই নয়। পর পর কয়দিনই আসা-যাওয়া চলিতে লাগিল। অনন্ত আরও শুনিল—এ-পক্ষের লোকও নাকি চৌধুরীবাবুদের বাড়ী গিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিয়াছে! তবে কি আপোষ-মীমাংসা চলিতেছে? নতুন স্কুল আরম্ভ করিবার ব্যবস্থাও যেন কিছু পিছাইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে। স্কুল একরকম বন্ধ! মণিকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলে সে-ও কিছু জানে না বলে!

দোস্‌রা আশ্বিন।

সকালবেলা দেশ হইতে চিঠি আসিল—তাহারা রওনা হইতেছে—মতিকাকার সঙ্গে—অনন্ত যেন ষ্টেশনে হাজির থাকে! খবরটা পাইয়াই অনন্ত নতুন বাসায় ছুটিয়া গেল। সমস্ত ঠিকঠাক্। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। ধোয়ানো মোছানো হইয়াছে। উনুনটাও গোবর-মাটি দিয়া নিকানো হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন আসিবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

সকালবেলা চন্দ্রনাথ খবর দিল—আজ বিকালে স্কুলের কমিটি রুমে মিটিং হইবে। সব পক্ষের লোকই উপস্থিত থাকিবে। চন্দ্রনাথকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আপোষ যদি হয় ভালই তো! মিছামিছি একটা ঝগড়া বিবাদ করা কি ভাল। এতদিনের একটা স্কুল—যদি মিট্‌মাট্ হইয়া যায়—সেই তো সব চেয়ে সুখের কথা!



আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

জিদের বশে না হয় আর একটা স্কুলই করা গেল—তাতে উপকার তো কারুর নেই—বরং একজনের ক্ষতি করা।

অনন্ত বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়—

কিন্তু মনের ভিতর তাহার খচ্ খচ্ করিয়া সন্দেহের কাঁটা বিঁধিতে লাগিল। সেদিন সেক্রেটারীর কাছে চন্দ্রনাথের কথায় অমন করিয়া মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছে! বলিয়া আসিয়াছে—আমরা নিজেরা ইস্কুল করবো—যত টাকা লাগে সব চন্দ্রনাথবাবু দেবেন—আর এখন···

এদিকের কাজ সারিতে একটু দেরী হইয়া গেল। বিকাল বেলা যখন অনন্ত স্কুলে গেল, দেখে চন্দ্রনাথের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—চৌধুরীবাবুর গাড়ীও রহিয়াছে। টিপি টিপি পায় কমিটি-রুমের বাহিরে গিয়া অনন্ত দেখিল—ভিতরে মজ্‌লিশ্ বসিয়াছে। বাহিরে আরও কয়েকজন মাষ্টার উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল— কই চন্দ্রনাথের সঙ্গে চৌধুরীবাবুর সে মনোমালিন্য কোথায়। গলা জড়াইয়া ধরিয়া দুইজনে আরো অনেকের সঙ্গেই সরবৎ সিঙাড়া সন্দেশ পান সিগারেটের শ্রাদ্ধ করিতেছে।—বেশ তো মিলিয়া গিয়াছে! কে বলিবে বাগবাজারের চৌধুরী-বংশের সঙ্গে মল্লিকবাবুদের বিবাদ—!

নন্দবাবু দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল—এই যে অনন্ত বাবু এসেছেন—সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই—এখনি মিটিং-এ ঠিক হোল—সব ছেলেদের আবার স্কুলে নেওয়া হবে—যা'দের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—তা'দেরও—আর—"

অনন্ত জিজ্ঞাসা করিল—আর—আর কি—?

—আর যে সব মাষ্টার ধর্ম্মঘটের সময় ছাত্রদের পক্ষ হ'য়ে লড়েছিল—তা'দের বরখাস্ত—অর্থাৎ আপনি, আমি—পরেশবাবু—মুরারিবাবু—

মিটিং বোধহয় ভাঙিল। একে একে সবাই বাহির হইয়া আসিয়া মটরে উঠিলেন। চন্দ্রনাথের গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজার মশাই আসিতেছিলেন। বলিলেন—এই যে—দেখা হ'য়ে গেল ভালই হোল—আপনি পয়লা এসে এ মাসের মাইনেটা নিয়ে যাবেন—এ-সব আপনার জন্যই যত গোল—আপনিই তো এই ইস্কুলে খোকাবাবুকে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন—বাবু ব'লে দিলেন আপনাকে আর—

অনন্ত শেষটা না শুনিয়াই চলিয়া আসিল।

ষ্টেশনের প্লাটফরমে ট্রেন তখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। একটা গুম্ গুম্ শব্দ হইতেছে চারিদিকে। বহুদূরে লাইনের উপর দৈত্যের চোখের মতন দুই চারিটা লাল নীল আলো দেখা যায়। অনন্তর মনে হইল ট্রেনটা যেন ছুটিয়া আসিতেছে। ছুটিয়া তাহার সামনে আসিল—তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরিতে লাগিল আর কেবলই মনে হইতে লাগিল—যেন ট্রেনটা তাহার বুকের উপর দিয়া আসিয়া তাহাকে পিষিয়া পিটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল—তারপর সরমা, খুকী, মতিকাকা······

# বাধা

স্বরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ইউনিভারসিটি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট সার মাইকেল স্যাড্‌লার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯১৮ সনে। তখন আমি বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলাম। কলেজের লেবরেটারী পরিদর্শন শেষ করে কমিশনের সভ্যরা অধ্যাপকদের সঙ্গে অধ্যক্ষের বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজে বসলেন। ভোজনান্তে তাঁর সঙ্গে একটু গল্প হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বল্লেন, আমি ইতিপূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সায়ান্স কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনের লেবরেটারিগুলি দেখে এসেছি। আজ আপনাদের লেবরেটারীও দেখলাম সকালে। সব জায়গায়ই দেখলাম লেবরেটারীর ব্যবস্থা উত্তম। একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগছে। এমন স্নবন্দোবস্ত থাকা সত্বেও মৌলিক গবেষণার পরিমাণ আয়োজনের অনুপাতে এত কম কেন ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যে তিনটি কথা বলেছিলাম এখানে তার মর্ম্মাংশ লিপিবদ্ধ করি। বল্লাম; বিষয়টি জটিল, তবে সরাসরি যে জবাবটা মনে জাগছে বলতে চেষ্টা করি। প্রথমতঃ, পৃথিবীর সভ্য দেশে কোথাও যা হয় না, আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে সেই দুরদৃষ্ট ঘটেছে। ছেলেবেলা থেকে শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি তথ্য ও প্রাথমিক ধারণামূলক বিষয়গুলি আমাদের স্কুলে ও কলেজে পড়তে হয় বিদেশী ভাষায়, যে ভাষার জ্ঞান আমাদের যৎসামান্য। স্নতরাং কতক বোঝা ও না-বোঝার অস্পষ্ট আলোকে আমাদের শিক্ষারম্ভ হয়। যে তথ্য বা তত্ত্ব সম্পূর্ণ বোধগম্য হ'ল না, তাকে মুখস্থ করে আয়ত্তাধীন করবার ব্যর্থ চেষ্টার সূত্রপাত হয় আমাদের শিক্ষারম্ভের প্রথম অধ্যায় থেকেই। মানুষের সব শক্তিা একটা সীমা আছে। ভাষার দুর্ব্বোধ্যতার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে করতে যদি তার অধিকাংশই খরচ হয়ে যায়, তবে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তার সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতে পারি না। যা বুঝলাম সেটাকে নিজের মাতৃভাষায় গুছিয়ে বলবার শিক্ষা যখন লাভ করিনি, তখন নিতান্ত অনায়ত্ত ইংরাজি বুলিতে তর্জ্জমা করে বলা দুঃসাধ্য, স্নতরাং বাধ্য হয়েই হতে হয় তোতা-পন্থী, অন্তরে নেই যার উৎসমূল, সেটা উদ্‌গীর্ণ করতে হয় কণ্ঠস্থ স্মৃতিস্থলী থেকে। বহু বৎসর ধ'রে এই রকম অস্বাভাবিক অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়ে যখন কলেজে প্রবেশ লাভ করি, তখন গেলা আর ওগ্‌রানোর ভিতর দিয়ে



আমাদের পুঁথিগত বিদ্যেটা আর ভিতরে তলাবার অবকাশ পায় না। আমাদের ইংরাজি ভাষাটা হয়ে দাঁড়ায় তালি-জোড়া দেওয়া কতকগুলি মুখস্থ টুকরার ছিন্নকন্থা, নিজের চরকায় কাটা মোটা সূতার খদ্দর নয়। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর এই ভাষার কুয়াশার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের বুদ্ধিটা হয়ে যায় ঘোলাটে, বিচার বিশ্লেষণের শক্তি ও ধারাবাহিকতা প্রায় হারিয়ে বসি।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের তুলনায় ইয়োরোপ মহাদেশটা যেন একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রশালা। বাংলার সমতল ভূমি ছেড়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে গেলেই চোখে পড়ে ছোট বড় পাহাড়ের পর পাহাড়। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই গিরিশ্রেণীর মত যন্ত্রদেবীর ঘর্ঘরমুখর অভ্রভেদী সৌধমালা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। কারখানা গৃহের মাথায় মাথায় ধূমকুণ্ডলিত চিম্‌নি শৃঙ্গ। রেলের গাড়ী, ষ্টীমার, জাহাজ, অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাগার, গোলাবারুদ কামানের আড়তে বিশ্বকর্ম্মার হাতুড়ি, নেহান হাঁফর। পথে-ঘাটে কলের মণিহারী কল্পদ্রুম, একটা পেনি বা শিলিং তার ফাটলে গলিয়ে দিলেই, লজেঞ্জুস, সিগারেট, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি বিবিধ বিলাসোপকরণের খয়রাৎ হয় করতলগত। দোকানে দোকানে কত রকমের কলের খেলনা, যেগুলির সঙ্গে ওদেশের ছেলেমেয়েদের আশৈশবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমের পোকার মত ওরা যেন কলকব্জার বুকের ভিতর পুষ্টিলাভ করে। পদ্মাতটের পল্লীশিশুরা যেমন অজ্ঞাতসারে সাঁতারু হয়ে ওঠে, তেমনি প্রতীচ্যের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যন্ত্রকুশলী হয়ে ওঠবার আনুকূল্য পায়।

শীতপ্রধান দেশে জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকবার জন্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাদের মত সহজলভ্য নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বহিরুপকরণের বাহুল্য। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষের উদ্‌ভাবনীশক্তি ফুটে ওঠে। যার অভাববোধ কম, সে অল্পে সন্তুষ্ট। জীবনের সব বিভাগেই অসন্তোষ অতৃপ্তির ভিতর দিয়ে মানুষের অর্জ্জন-প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ হয়। যে দেশের নরোত্তম সাত্ত্বিক সম্পদের ঋদ্ধিমত্তায় পার্থিব প্রতিষ্ঠার প্রতি বীতরাগ হয়ে বলেন, "কৌপিনবন্তঃ খলু-ভাগ্যবন্তঃ" সে দেশের স্থূলদর্শী সাধনবিমুখ আপামর সাধারণ আলস্যে ও ঔদাস্যে হয় "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ", ইহকাল পরকাল দুইই হারিয়ে বসে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ও সন্ধি করবার শক্তি যা' আমাদের দেয়, তারই নাম শিক্ষা। মাছের পোনার পক্ষে সন্তরণকুশলী হওয়াই তার প্রকৃত শিক্ষার ফল। কেমন ক'রে ভাল রকম উড়তে পারা যায়, সে উড্ডয়ন-বিদ্যা তার পক্ষে অবান্তর। ইয়োরোপের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত ও অভিব্যক্ত হয়েছে ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র দাবী ও আনুকূল্যের দ্বারা। সময় ও শক্তির ব্যয় সঙ্কোচের জন্যই ত যন্ত্রের উদ্ভব। যন্ত্রকুশলী মানুষ যেন একটা অপ্রমেয় শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছে তার সৃজন নৈপুণ্যে। তার স্বরচিত যন্ত্রশালাগুলিতে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রের সিংহদ্বার। আমরা এখনো প'ড়ে আছি প্রায় আদিম মানবের যন্ত্রবিরল দৌর্ব্বল্যের

সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। আমাদের ঢেঁকি বহু যুগ পূর্বে যে মূর্তিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আজও তার রূপান্তর ঘটেনি। অধুনা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে আমরা পেয়েছি এমন সব রুচি, আচার ও আদর্শ, যাদের আনুসঙ্গিক উপচার উপকরণাদি, আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাসের প্রেরণায় বাধ্য হয়ে সংগ্রহ-তৎপর হয়েছি পশ্চিমের পণ্যবীথিকায়, আমাদের যথাসর্বস্ব খুইয়ে। যদি এই সব নূতন খেয়াল ও নেশার সরঞ্জাম নিজেরাই প্রস্তুত করতে পারতাম, তাহ'লে আধ্যাত্মিক না হোক, অন্ততঃ আধিভৌতিক সমৃদ্ধিলাভ করবার দিকে অগ্রসর হতে পারা যেত। কিন্তু আমাদের সকল রকম বিলাতী বাহুল্যের খোরাক যোগাই ঘরের কড়ি উজাড় ক'রে দিয়ে। আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে পশ্চিমের বিলাসসম্ভারে এবং সেই সঙ্গে ক্রমশঃ হয়ে পড়ছি দেউলে অন্তরে ও বাহিরে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা দীক্ষা কাজে লাগাতে পারি—এমন প্রয়োগক্ষেত্র নিতান্ত বিরল ও ক্ষুদ্রায়তন। অনেক স্থলে এ শিক্ষা কার্যকরী ত হয়ই না বরং প্রতিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। বহু বৎসর ধরে' যে বিপুল সংগ্রহ পুঞ্জীভূত ক'রে তুললাম, কোনো কাজেই তারা লাগল না। যেসব ব্যবসা ও বৃত্তি অশিক্ষিত আত্মীয়-কুটুম্বেরা বিনা দ্বিধায় অবলম্বন ক'রে জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হয়, অকেজো শিক্ষার গর্বে সে সব কর্ম হেয় ও বর্জনীয় বিবেচনা করি। পিতৃপিতামহদের পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অর্থ-সম্বল নষ্ট করি, জোতজমি বেচে সহরে এসে জুটি নকুরির ধাক্কায়। আইনের পরীক্ষা পাশ ক'রে সামান্য বেতনে স্কুলমাষ্টার বা গৃহশিক্ষকের পদে বাহাল হই, যদি দৈবকৃপায় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে এম-এ অথবা এম-এস-সি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে, তিন বৎসর রিসার্চ-স্কলারশিপ ভোগ ক'রে শেষকালটা অফিসের কেরাণী-গিরিতে বৈজ্ঞানিক প্রারম্ভের যবনিকা পতন হয়। বাঘবন্দী খেলার ছকে যখন ছাগলের সব চালগুলিই মারা যায় তখন পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া কী গত্যন্তর আছে? যখন পেটে নেই ভাত, পরণের বস্ত্রখণ্ডের অভাব, বুকের উপর পারিবারিক দায়িত্বভারের জগদ্দল পাথর, তখন মৌলিক গবেষণার বন্যহংসীর সন্ধানে ছুটবার শক্তি ধারণ করে—এরূপ দুর্দ্ধর্ষ শিকারী 'লাখে নাহি মিলে এক।' তবু এত প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তারাই কেবল জয়লাভ করে, যাদের প্রাণশক্তি দুর্দমনীয়, এবং বিজ্ঞানের জন্য নিষ্কাম প্রীতি মজ্জাগত। আমাদের ভাষা বিভ্রাট, সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতি, শিক্ষার সঙ্গে তদুপযোগী কার্যক্ষেত্রের অভাব ও অসামঞ্জস্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রোদ্ভাবনী প্রতিভার বিষম অন্তরায়। বাইশ বছর আগে সার মাইকেলের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার অনুধ্বনি লিখিত হ'ল। আমাদের শিক্ষা বিভ্রাটের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বিজড়িত। সে বিতর্কের কথা উত্থাপন করলাম না। বিগত পঁচিশ বৎসরে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাবিভাগেও আদর্শ ও রীতির রূপান্তর লক্ষিত হয়। এই যুগসন্ধির সময়ে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করবার সময় উপস্থিত। দেশকালোচিত শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার উপর বাংলার ভবিষ্যৎ একান্ত নির্ভর করছে।

# চোখ

( T. O. Beachcroft-এর Eyes গল্পের অনুবাদ )

বিশ্বনাথ চৌধুরী

হাসপাতালে একটি দীর্ঘ দিন কাটলো।

অস্থির পদক্ষেপে ডাঃ সিল্‌ভেস্টার বারান্দা পার হ'য়ে রাস্তার গেটের দিকে এলেন। তিনি যেন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন—গতি ক্রমশঃ দ্রুত হ'তে লাগ্‌লো। শীতের সন্ধ্যার শিশির লেগে দেয়ালের সবুজ আস্তরণ ভিজে স্যাঁতসেতে হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত পথ কুয়াসায় ঢাকা—বিদ্যুতের আলোগুলো যেন ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

হাতের দস্তানাটা লাগিয়ে ডাঃ সিল্‌ভেস্টার দরজায় একটা ঝাঁকানি দিলেন—দরজা খুলে যেতেই তিনি পিছন থেকে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালেন।

'ডা-ক্তা-র, ডা-ক্তা-র সিল্‌ভেস্টার!'

'মরুকগে ছাই!—এখন আবার কি?' ডাঃ সিল্‌ভেস্টার বিড়বিড় ক'রে বক্‌তে লাগ্‌লেন।

এক সেকেণ্ড! আর এক সেকেণ্ড হ'লেই ত তিনি হাসপাতাল পার হ'য়ে বাইরে চ'লে যেতে পার্‌তেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ ক'রে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পিছনে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল।—কিন্তু উপায় নেই, একটা নার্স ছুটে এসে তাঁকে ধ'রে ফেল্‌লে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত ডাক্তার, কিন্তু কি কর্‌বো—সিস্টার আপনি চ'লে যাবার আগে ডাকতে বল্‌লেন।'—হাঁপাতে হাঁপাতে সে বল্‌লে।

'কি, ব্যাপার কি?'

'ডাঃ স্টার্নডেল এখনও আসেননি,—একটা কেস্ এসেছে রিসিভিং রুমে অপেক্ষা করছে—আমার মনে হয়—'

ডাঃ সিল্‌ভেস্টার সে কথায় কান না দিয়ে দ্রুতগতিতে ওপরে উঠে এলেন। মুখখানায় রক্তের চিহ্নমাত্র নেই, শ্রান্তিতে ধূসর দুটি চোখ। পাণ্ডুর ঠোঁট মুখের চেয়েও করুণ।

সিল্‌ভেস্টার ধাক্কা দিয়ে রিসিভিং-রুমে ঢুকলেন—সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

'কি ব্যাপার?'—সিল্‌ভেস্টার প্রশ্ন কর্‌লেন।

সিস্‌টার সেখানে উপস্থিত ছিল : একপাশে বেঞ্চের উপরে একটি তরুণী, বয়সের চেয়ে চেহারায় বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে, পরিধানে অপরিচ্ছন্ন নোংরা পোষাক। পাণ্ডুর বিবর্ণ গালে পাউডারের স্পর্শমাত্র নেই—শুষ্ক ঠোঁট দুটিকে সে লিপষ্টিকে রঞ্জিত করেনি—তাকে দেখেল মনে হয়, তাকে সুন্দর দেখালো কি কুৎসিত দেখালো তা'তে তার কিছু যায় আসে না। কোন কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। চার পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ে শিথিল ভঙ্গীতে বাহুর ওপরে এলিয়ে পড়েছে। শিশুর সমস্ত দেহ শক্ত হ'য়ে গেছে—হাত দু'টো যেন নাড়াচাড়া করতে পারছে না। সমস্ত মুখ রক্তাভ, চোখে রক্ত জ'মে গেছে মনে হয়। শ্বাস টানতেও যেন অনেক কষ্ট। শিশুটি জ্বরের ঘোরে তন্দ্রাচ্ছন্ন কিম্বা হয়ত অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কা'রও মুখে কোন কথা নেই। নিস্তব্ধ অসাড় মুহূর্ত্ত।

সিল্‌ভেস্‌টার পিছন ফিরে কোট আর দস্তানা খুলে টেবিলের ওপর রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন, 'তারপর ?'

'মিনিট পনের হ'লো এই শিশুটিকে এখানে নিয়ে এসেছে—' সিস্‌টার আরম্ভ করলে, 'ডাঃ স্‌টার্‌নভেলের আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে—আর কেস্‌টা—'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার বল্‌লেন, 'কি ক'রে এরকম হ'লো ?'

স্ত্রীলোকটি বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না তাকে প্রশ্ন করা হ'য়েছে কিনা, সিস্‌টারের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে, 'কাল থেকে—'

সিল্‌ভেস্‌টার অস্থির পদক্ষেপে সমস্ত ঘরটা পরিক্রমণ করছেন, তাকে থামতে দেখে বল্‌লেন—'হ্যাঁ বলো, তারপর ?'

'কাল সকালে যখন ঘুম থেকে উঠ্‌লো—কিরকম যেন দেখাচ্ছিল ওকে—চোখে মুখে অসুস্থতার চিহ্ন। আমার স্বামী ওকে দেখেই বল্‌লেন, 'দেখেছ ওর চোখ ? কি ক'রে ওরকম হ'লো বলো ত ?' আমি ভাবলাম ঠাণ্ডা লেগে হয়ত ওরকম হয়েছে—' —এই পর্য্যন্ত ব'লে স্ত্রীলোকটি থাম্‌লো। ডাক্তারের অস্থিরতা দেখে সে একটু মুসড়ে গিয়েছিল। হয়ত সে কোন কথাই শুন্‌ছিল না—দু'একবার এমন অসহিষ্ণু ভাব দেখাচ্ছিল যে, তার কাছে সমস্ত কাহিনীটা শেষ করা কঠিন মনে হ'লো।

বিদ্যুতের তীব্র আলোয় সকলের মুখ মৃতের মত শাদা দেখাচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি আবার আরম্ভ কর্‌লে, 'কাল সমস্ত দিন ধরেই কিরকম যেন একটা ম্যাজমেজে ভাব—আর তার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত চুপ ক'রে প'ড়ে ছিল। এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকা আমার ভাল লাগ্‌ছিল না। অল্প একটু ঝোল ক'রে খাওয়ালাম—খাওয়ারও যেন বিশেষ ইচ্ছা নেই—অনিচ্ছাসত্ত্বে একরকম খাওয়ানো।'



সিল্‌ভেস্‌টার মেয়েটির বাহুর নীচে থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। নাড়ী পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন—হাতের উত্তাপ খুব বেশী। নাড়ী খুব ধীরে ধীরে থেমে থেমে চল্‌ছে। চোখের পাতাটা টেনে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। সমস্ত চোখে রক্ত জমে গেছে—মণিটাও ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজে এলো। মেয়েটি একটু শব্দও কর্‌লে না। তার মায়ের দিকে ফিরে ডাক্তার বল্‌লেন, 'তারপর, থাম্‌লে কেন ?'

সে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, 'আমার স্বামী ফিরে এসে বললে—'ছাখো, ওর চোখটা যেন কিরকম মনে হ'চ্ছে !—সকাল বেলা যদি একটু ভাল না হ'য় আমাদের ডাক্তার দেখান উচিৎ।' আমি তাকে বল্‌লাম 'ঘুমিয়ে পড়ে কিনা দেখি'—ভেবেছিলাম হয়ত বিশেষ কিছু হয়নি।'

সিল্‌ভেস্‌টার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা কর্‌ছিলেন, সুতরাং সে চুপ ক'রে গেল।

স্থাণুর মত সে বসেছিল—যদিও যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল তার এরকমভাবে শিশুটিকে কোলে ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে।

এখনই হয়ত সে জান্‌তে পারবে তার মেয়েটি কেমন আছে। কোন ভয় আছে নাকি ? ডাক্তার হয়ত কিছু বল্‌বেন তাকে—সে প্রতীক্ষা কর্‌ছিল।

ডাক্তার কিন্তু থার্ম্মোমিটারের দিকে না তাকিয়েই সিস্‌টারের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। মনে হ'লো, দেখবারও যেন কিছু প্রয়োজন নেই। সিল্‌ভেস্‌টার জান্‌তেন জ্বর একশ' দুই ডিগ্রীর উপরেই হবে। শুষ্ক কঠিন গলায় সিল্‌ভেস্‌টার প্রশ্ন কর্‌লেন, 'তারপর ?'

'বেশ ত ঘুমিয়েছিল,' মহিলাটি ব'লে যেতে লাগ্‌লো—'ঠিক সুস্থ লোকের মত। আমি মনে করলাম সেরে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু কেমন যেন অসাড় নিশ্চুপ অবস্থা, তন্দ্রার ঘোর যেন কিছুতেই কাটে না—এক রকম ভাবেই বিছানায় নেতিয়ে প'ড়ে ছিল। আজ সন্ধ্যায় কিছুতেই আর ডেকে সাড়া পাইনা। আমার স্বামী তখনও ফেরেননি। কি করি আর ?—সোজা এখানে চ'লে এলাম।'

'তোমার স্বামী ফেরেননি ?'

'না।' একটু থেমে আবার বল্‌লে, 'আমার আরও দু'টি ছেলে আছে—এই সব চেয়ে বড়।'

সিস্‌টারকে লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার নিম্নস্বরে উপদেশ দিয়ে কোটটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন।

সিস্‌টারও যেন ডাক্তারের কথার উত্তরে কি বল্‌লে।—তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তার আবার বল্‌লেন, 'তোমাকে আর কিছু কর্‌তে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি—তুমি শুধু মেয়েটিকে দেখো।' দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে সিল্‌ভেস্‌টার আবার ফিরে দাঁড়ালেন। মহিলাটি তখন শিশুটিকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'আচ্ছা, নমস্কার।' ডাক্তার আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা কর্‌লেন না।

আবার তিনি গেটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন—দরজা বন্ধ হ'লে আর যেন তাঁকে ফিরে আসতে না হয়—না আর তিনি পারেন না—শ্রান্তিতে স্নায়ুগুলো অবশ হ'য়ে আসছে। এখন তাঁর বিশ্রাম দরকার—অনেক তিনি ক'রেছেন—আর নয়।

চলতে তিনি পারেন না। গতি ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজার সামনে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—কি যে কর্‌বেন ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেন না—হাতের দস্তানাটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন।

তিনি ত থাকবার সমস্ত উপদেশই দিয়ে এসেছেন—আর স্টারনডেলও এসে গেছে এতক্ষণ। ফিরে গিয়ে শুধু এই কেসটা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা এখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত শরীর তাঁর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে।

শিশুটির কথা তিনি ভাবেন না—ও আর কতক্ষণ?—মেনিনজাইটিস তাড়াতাড়ি নিঃশেষ ক'রে দেয়। চোখের তারায় পৃথিবীর ছবি শেষবারের জন্য একবার ফুটে উঠেছে—অসহায় করুণ দু'টি চোখ।

এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন, তারপর বাড়ীর পথে অগ্রসর হ'লেন।

কিছুক্ষণ চলার পরে কি ভেবে নিঃশব্দে আবার সেই পথেই ফিরে এলেন—যেন তিনি কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছেন—এম্‌নি চুপি চুপি গেট পার হ'য়ে হাসপাতালের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরিয়ে একটু আরাম ক'রে টানলেন—মিনিট দশেক তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—দূর থেকে মহিলাটিকে সেই পথেই আস্‌তে দেখ্‌লেন। 'আমি বোধ হয় ঐ পথেই যাবো—এক সঙ্গেই যাই চলো।' সিল্‌ভেস্‌টার বললেন।

মহিলাটির মুখে কোন কথা নেই। নিঃশব্দে চল্‌তে লাগ্‌ল।

'সিস্‌টার কি তোমায় কিছু বলেছে?'—ডাক্তার বল্‌লেন।

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার আবার আরম্ভ কর্‌লেন, 'ওই শিশুটি তোমার একমাত্র সন্তান নয় তুমি বল্লে, না?'



'আরও দু'টি আছে।' অন্যদিকে চেয়ে সে উত্তর কর্‌লে।

'কিন্তু ও-ই তোমার প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'আর সবাই ত বেশ সুস্থ আছে?'

'তা আছে। কিন্তু ওর ত এর আগে কিছু হয়নি, বেশ সুস্থই ছিল। কাল যদি ওদের কারও আবার ওরকম হয়? ওই রকম চোখে রক্ত জমে থাকে? আমি কি কর্‌বো তাহ'লে? কি ক'রে ওদের বাঁচাবো বলুন?'

'আমাদের বাঁচারই বা কি স্থিরতা আছে!' কথাটা সমবেদনার সঙ্গে বল্‌লেও অনেকটা বিদ্রূপের মত শোনাল।

আবার দু'জনেই চুপ। পথের শেষে এসে সিল্‌ভেস্‌টার বল্‌লেন, 'আচ্ছা, আসি তাহ'লে।'

কুয়াশায় আর অন্ধকারে আর তাঁকে দেখা গেল না—সিল্‌ভেস্‌টার দ্রুত পদক্ষেপে চল্‌তে সুরু কর্‌লেন। তাকে আর কিছু বল্‌লে হয়ত ভাল হ'তো। কিন্তু কি হবে। একটি মৃত্যুর জন্যে সান্ত্বনা প্রকাশ ক'রে, যখন প্রতি মুহূর্ত্তেই অনেক মৃত্যুর মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হ'চ্ছে।

কুয়াশার আব্রুর মধ্যে বিদ্যুতের আলোগুলো অস্পষ্ট।

চল্‌লে চল্‌তে সিল্‌ভেস্‌টার ভাব্‌লেন, পৃথিবীতে কেউই নিরাপদ নয়। ডাক্তারকেও প্রতিদিন কত রকমের বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়—কত রকম রোগের সংক্রামক বীজাণু, হাসপাতালের বাইরে এসেও সে নিরাপদ হ'তে পারে না।—আলো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সিল্‌ভেস্‌টার অন্ধকারকে অনুভব করার চেষ্টা কর্‌লেন।

আজকের দিনের ঘটনা তিনি এত চেষ্টা ক'রেও ভুল্‌তে পার্‌ছেন না। স্থাণুর মত সেই মহিলাটি এখনও যেন রুগ্ন মেয়েকে কোলে ক'রে ব'সে আছে। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন চোখ, বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ঝল্‌সে যাচ্ছে, কোন সাড়া নেই—নিস্পন্দ, অসাড়। মৃত্যুর মত শীতল স্তব্ধতা। অসহায়, আর্দ্র দু'টি চোখ—সে-চোখের দৃষ্টি সিল্‌ভেস্‌টার এত চেষ্টা ক'রেও ভুল্‌তে পার্‌ছেন না। হঠাৎ সিল্‌ভেস্‌টার মোড় ফির্‌লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে হাসপাতালের দিকেই রওনা হ'লেন।

'সিল্‌ভেস্‌টার!' স্টার্‌নডেল আদেশের সুরে বল্‌লেন ঘণ্টাখানেক পরে, 'আমি সত্যি তোমাকে এখনও এখানে থাক্‌তে দেখে বিস্মিত হ'য়েছি। তুমি কি বাড়ী যাওনি? কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল?'

'ঘণ্টা দুই হয়ত ঘুমিয়েছি। আজ শরীরটা মন্দ নেই—তবে খুব ক্লান্ত মনে হ'চ্ছে।'

'সত্যি, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমে তোমার চোখ বুজে আস্‌ছে—স্বপ্নের মধ্যে তুমি যেন চলাফেরা করছো। বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও—এত পরিশ্রম সহ্য হবে না।'

'আমি রাত্রে এখানে থাক্‌বো মনে করছি—একটা জিনিষ দেখার আছে।'

'কিছুমাত্র নেই। আমি ত থাক্‌বো এখন—দরকার হ'লে সমস্ত রাত। কিসের জন্যে তুমি বল্‌চো ?'

'একটা মেনিন্‌জাইটিস্ কেস্ আছে বি ওয়ার্ডে।'

'ও, আজ সন্ধ্যায় যাকে ভর্ত্তি করা হ'লো ? তোমার আর সেজন্যে আবশ্যক হবে না। আমি তোমাকে বিস্তারিত সব বল্‌তে পারি। তার বাঁচার কোন আশা নেই।'

শুষ্ক কঠিন দৃষ্টিতে নীচের দিকে চেয়ে সিল্‌ভেস্‌টার জবাব দিলেন, 'তা আমি জানি। সেই জন্যেই আমার থাকা আরও দরকার।'

'তার মানে ?'

'মৃত্যুর মুহূর্ত্তে আমি মেয়েটির চোখ দু'টি একবার দেখ্‌তে চাই।'

স্টারন্‌ডেল একটু থেমে বল্‌লেন, 'শোনো, এর পরে দেখার আরও সুযোগ পাবে—শেষে বিপদে পড়্‌বে—যা বল্‌চি তাই ক'রো।'

'সে ভয় নেই।'

'তুমি কি করতে চাও শুনি ?'

চোখ না তুলেই সিল্‌ভেস্‌টার ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, 'এরকম সুযোগ ছাড়া উচিৎ নয়। সুতরাং—মেয়েটি বোধহয় এতক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ও এরকম অবস্থাতেই থাক্‌বে। আমার মনে হয়, খুব বেশী হ'লে ভোর পর্য্যন্ত টি'কতে পারে। তারপর বিশ্রাম করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমি যা দেখ্‌তে চাই তুমি তা কোন দিন দেখেছ ?'

'বল্‌তে পারি না। বোধ হয় না।'

'শুধু একবার—একবার মাত্র দেখেছি। আবার দেখ্‌তে চাই। শুধু সেই-জন্যেই আজ রাত্রে এখানে থাক্‌বো।'

স্টারন্‌ডেল তার হাতটা মুঠির মধ্যে নিয়ে বল্‌লেন, 'রোগটা সংক্রামক তা বোধহয় তোমার জানা আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুটির মুখের ওপর নুয়ে তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গেই অনেক বীজাণু



থাকে তা বোধহয় তোমায় ব'লে দিতে হ'বে না। তুমি আমার কথা রাখো—তা ছাড়া বাড়ীতে তোমার ছেলে, তোমার স্ত্রী র'য়েছে। তাদের ওপরও তোমার কর্ত্তব্য আছে নিশ্চয়ই—তোমার শরীরের যা অবস্থা—নিজের বিপদ নিজে টেনে এনোনা সিল্‌ভেস্‌টার।'

সিল্‌ভেস্‌টার হেসে উত্তর দিলে, 'তোমার উপদেশ মেনে নিতে পারলাম না ব'লে দুঃখিত বন্ধু।'

তারপর অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলেন।

মুমূর্ষু শিশুটির পাশে তিনি একা। সমস্ত ঘরে অন্ধকারের কালো ছায়া—শুধু রোগীর শিয়রে একটা আলো—একটু বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। ঘরের মধ্যে সিল্‌ভেস্‌টার অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। শুধু তাঁর শরীরের দীর্ঘ ছায়াটা সমস্ত ঘরে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটির মুখের ওপর থেকে আলোটা এক একবার স'রে যাচ্ছে তাঁর পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন। নিঃশ্বাস পতনের শব্দও খুব অস্পষ্ট।

সিল্‌ভেস্‌টার বিছানার দিকে নুয়ে স্থির অপলক দৃষ্টিতে কি যেন দেখবার জন্য ব্যগ্র। তাঁর মাথাটা একেবারে মুমূর্ষুর মুখের ওপর—নিঃশ্বাস কপালে এসে লাগ্‌ছে।

রাত বোধহয় তিনটে। সিল্‌ভেস্‌টারের সেদিকে খেয়াল নেই। মৃত্যুর পরপারের ইঙ্গিত যেন ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হ'য়ে আস্‌ছে। পাষাণের মতন শীতল মুহূর্ত্ত বেদনায় পাণ্ডুর।

সিল্‌ভেস্‌টারের দৃষ্টি আরও একাগ্র। একবার দূর থেকে চেয়ে দেখে আবার কাছে আসেন। পাশাপাশি আরও তিনটি শয্যা শূন্য। তারই একটা আশ্রয় ক'রে সিল্‌ভেস্‌টার একটু চেপে বস্‌লেন। হাতে একটা বই। অস্পষ্ট আলোয় পড়া যায় না—বইটা রেখে দিয়ে আবার তাঁকে উঠতে হ'লো। বোধহয় ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েটি এই অবস্থায় থাক্‌বে। ভোর হ'তে আর কত দেরী ? ঠিক এতটা সময় নেবে সে আশা করতে পারেনি।

স্টারনডেলের কথাটা একবার তার মনে হ'লো। সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু, কিছু বলা যায় না।

হয়ত এই থেকে তাঁর প্রিয় সন্তানের শরীরেও এই বীজাণু প্রবেশ করতে পারে। হয়ত পরের দিন সকালে তিনি দেখ্‌বেন তাঁর ছেলেটির চোখ দুটোও এমনি রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে। এই মেয়েটির মা-ও প্রথমে চোখ দেখেই ত টের পেয়েছিল। সিল্‌ভেস্‌টারের

নিঃশ্বাস ফেল্‌তেও যেন কষ্ট হ'চ্ছে। তিনি পাশের শয্যায় শুয়ে পড়লেন। Opthalmascopeএর উজ্জ্বল আলো মুমূর্ষুর চোখের ওপর এসে পড়েছে। এট্রোপিন দিয়ে চোখের মণিকে অসাড় ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। সিল্‌ভেসটার থাক্‌তে না পেরে উঠে এলেন। চোখ দেখে মনে হ'লো গভীর অতলস্পর্শী শুধু লাল, আর কিছু দেখা যায় না। কোথাও একটুও শব্দ নেই। নিস্তরঙ্গ চোখের পাতাও আর নড়ে না। সেই লাল আলোয় সমাচ্ছন্ন সিল্‌ভেস্টারের দৃষ্টি। সময়ের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই।

এক মুহূর্ত্ত। আর একটু পরেই সব শেষ হ'য়ে আস্‌বে। এখনও মস্তিষ্কের কোষে শোণিতধারা প্রবাহিত—ক্রমশঃ সমস্ত শিরা স্নায়ুগ্রন্থি সব শিথিল হ'য়ে যাবে। প্রথমে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হবে, তারপর হৃৎপিণ্ড—তারপর ?

মোহাচ্ছন্নের মত সিল্‌ভেস্টার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, চোখটা ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে আসছে।

সিল্‌ভেস্টার উঠে দাঁড়ালেন। কি রকম যেন অস্বস্তি লাগ্‌লো তাঁর। অদ্ভুত মৃত্যু! কোন শোক নেই, চোখের জল নেই, শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞাতব্য একটা রহস্য ছাড়া আর কিছু নয়।

সিল্‌ভেস্টার চোখ বন্ধ ক'রে দেখ্‌লেন—তাঁর মনে হ'লো চোখ বুজলেও তিনি লাল ছাড়া আর কিছু দেখ্‌ছেন না। শুধু লাল, অসহ্য লাল তাঁর সমস্ত দৃষ্টি ছেয়ে আছে। কলিং বেল টিপতেই নার্স এলো।

আর নয়, সিল্‌ভেস্টার কোন রকমে হাসপাতালের গেট পার হ'য়ে গেলেন।

রাস্তায় একটি প্রাণীও নেই। বাতাসে শীতের ধার। সমস্ত শরীর তাঁর অবশ হ'য়ে আসছে। এতটা পথ তিনি যেন নেশার ঘোরে চলেছেন। স্টারনডেলের অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁর উচিত হয়নি। সংক্রামক রোগীর পাশে সমস্ত রাত তিনি জেগে কাটালেন। যদি এখন কিছু হয়? এই থেকে তাঁর ছেলের শরীরেও রোগ প্রবেশ করতে পারে।

স্বপ্নের ঘোরে যেন তিনি চল্‌ছেন। তাঁর একবার মনে হলো, পৃথিবীতে কেউই নিরাপদ নয়। হয়ত তাঁর শরীরে বীজাণুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। একটু পরেই হয়ত তা মারাত্মক ভাবে দেখা দেবে—সিল্‌ভেস্টার আর ভাবতে পারেন না।

অন্ধকারে আলো না জেলেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন। মায়ের বুকের কাছে শিশুটি নিদ্রিত। তাঁর স্ত্রী একটুও টের পেল না।



সিল্‌ভেস্টার কোটটা কোন রকমে টেনে ফেললেন। ঘড়িতে দম দিতেও ভুলে গেলেন। ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে আস্‌ছে। কোন রকমে একটা র‍্যাগ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যেই সিল্‌ভেস্টার অস্ফুট শব্দ কর্‌লেন। যেন কোথায় সাগরের অতলে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যেন কিছুতেই পার্‌ছেন না ফিরে আসতে। ক্রমশঃ যেন সমস্ত শরীর অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। সিল্‌ভেস্টার চীৎকার ক'রে উঠলেন। চোখ খুলে তিনি তাকাতে চেষ্টা করলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হ'লো, সমস্ত দেহটা যেন ভারী, অবশ হ'য়ে গেছে।

পাশের বিছানায় স্ত্রী জেগেছে তাঁর আগে।

'ও কি! কি করছো?'

'আমাকে এখুনি উঠতে হ'বে, কি দারুণ স্বপ্ন দেখ্‌লাম!'

তাঁর দিকে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে তাঁর স্ত্রী বল্‌লে, 'ওকি! তোমার চোখে কি হ'লো?'

'কেন? কি বলো ত?'—নার্ভাসভাবে সিল্‌ভেস্টার বললেন।

'একেবারে রক্ত জ'মে গেছে দেখ্‌ছি—এত লাল হ'লো কি ক'রে?'

'আয়নাটা একবার দাও ত?'

বাস্তবিকই তিনি আর্‌সিতে দেখ্‌তে পেলেন তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। তখন তিনি সব বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

আর কোন আশা নেই। অদ্ভুত রকম শান্তভাবে স্ত্রীকে সব কথা খুলে বল্‌লেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ তাঁরা চুপ ক'রে রইলেন। হঠাৎ সিল্‌ভেস্টার বল্‌লেন, 'তাড়াতাড়ি স্টারনডেল্‌কে ফোন ক'রে বলো, সে এসে একটু কিছু কর্‌তে পার্‌বে।'

তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেন, টেলিফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর হাত কাঁপছে। কথা যেন আট্‌কে আসছে তার। বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বল্‌লে, 'তোমার সঙ্গে তিনি কথা বল্‌তে চান।'

স্টারনডেলের দৃঢ় কণ্ঠস্বর তিনি শুন্‌তে পেলেন।

'সিল্‌ভেস্টার নাকি? আমার কথা তোমার শোনা উচিত ছিল। তুমি একটু বেশী নার্ভাস হ'য়ে পড়েছ। তুমি প্রথম সেই রোগীটিকে দেখেছ বোধহয় বার ঘণ্টা কি

তার কম। যা কিছু আশঙ্কাজনক শেষের দিকটা। বোধহয় শেষ তিন ঘণ্টা তুমি ওর কাছে ছিলে—যে-সময় হয়ত কোন রকম Infection হ'তে পারে।'

'হ্যাঁ।'—সিল্‌ভেস্‌টার ভাঙা গলায় বল্‌লেন।

'তাহ'লে বুঝ্‌তে পারছো!'—স্টারন্‌ডেল একটু ঠাট্টা করলে।

'তাইত আমার ত মনেই ছিল না।' সিল্‌ভেস্‌টার একরকম চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'আমি কি পাগল হয়ে গেলাম—এই রকম মারাত্মক ভুল ডাক্তারের! এত অল্প সময়ে Infection ত টেরই পাওয়া যায় না।'

'আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণ পরে তুমি নিজের নামও ভুলে যেতে পারো। এখন ঘুমোও ত লক্ষ্মীছেলের মত—আচ্ছা, নমস্কার'।

রিসিভারটা রেখে সিল্‌ভেস্‌টার আপন মনে বলে যেতে লাগ্‌লেন—'ডাক্তার হ'য়ে এই সামান্য জিনিষটা ভুলে গেছি। সত্যি, কি মারাত্মক ভুল—যাক্‌ বাঁচা গেল।' একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সিল্‌ভেস্‌টার এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

'কিন্তু তোমার চোখ ওরকম হ'লো কেন?'—স্ত্রী বললে।

'ও কিছুই নয়—একটা nervous re-action. কাল থেকে সমস্তক্ষণ ওই কথাই ভাবছি কিনা। আর সত্যি এত শ্রান্ত ছিলাম! অদ্ভুত কিন্তু, মনে যা ভাবা যায় বাইরে তা আশ্চর্য্য রকম ফুটে ওঠে। আমি কিন্তু সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।' বিছানায় শুয়ে সিল্‌ভেস্‌টার উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠলেন।

তাঁর চোখের এক কোণে জল।

শ্রীমতী কানন

সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের 'অভিনেত্রী' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন।

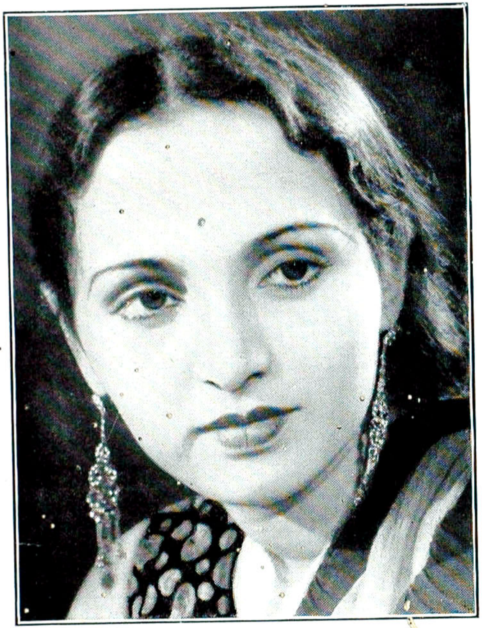

শোভনা সমর্থ

হিন্দুস্থান সিনেটোনের 'সৌভাগ্য' চিত্রে ইনি অপূর্ব্ব অভিনয় ক'রেছেন।

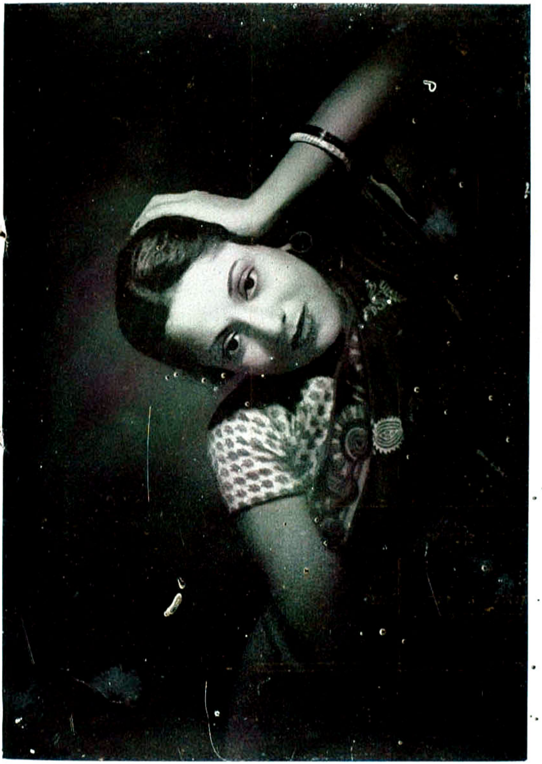

লীলা চিটনিশ

'কঙ্কন' চিত্রে ইনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বম্বে টকীজের 'আজাদ' ও 'বন্ধন' চিত্রে শীঘ্রই এঁকে আবার দেখা যাবে।

শ্রীমতী প্রভা

সাগর পিকচার্সের কয়েকখানি চিত্র এঁর অভিনয়-উৎকর্ষে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শ্রীমতী লীলা দেশাই

সম্প্রতি ইনি দেবকী বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'নর্ত্তকী' চিত্রে নাম-ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন।

শ্রীমতী মলিনা

নিউ-থিয়েটার্সে'র 'আলোছায়া' চিত্রে এঁ'র অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

# চিত্র-শিল্পের একটি দিক

সুধীরেন্দ্র সান্যাল

ভারতের মৃত্তিকায় ফিল্ম-শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হ'তে সুরু হ'য়েচে কথক ছবির অভ্যুদয়ের পর থেকেই।

আজ আমাদের পৌর-জীবনের সহজলভ্য ও সুলভতম আমোদ-অনুষ্ঠান হিসেবে সিনেমার দাবীকে স্বীকার কোরে নিয়েছি। শুধু, নিছক আনন্দ পরিবেশনের বাহন হিসাবেই নয়, জাতি-গঠনেও, অল্প-বিস্তর নানাদিক দিয়ে সিনেমার প্রভাব আমরা উপলব্ধি কোরেছি।

গত দু'বছর কাল ধ'রে বাঙ্‌লার একটি প্রাচীনতম চিত্র-প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক টপিক্যাল্ ছবি তুলে আসছেন। এই শ্রেণীর Short-reeler ছবিগুলি, programme-filler হিসেবে বিশেষ উপাদেয় হ'য়েচে। শুধু news-interest-এর জন্যই নয়, এই সব Shortগুলির educative value-ও আছে যথেষ্ট।

আমরা এতদিন ধরে অরণ্যে রোদন কোরে এসেছি। বাঙ্‌লার একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানও যে এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এজন্যে তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

চিত্র-জগতে আজ এসেচে সামাজিক ছবির যুগ। সামাজিক কাহিনীকে কেন্দ্র কোরে, সারা ভারতে আজ চলচে ছবি তোলার মরশুম।

দর্শকের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে নানা সমস্যার ইঙ্গিত ও সমাধানের দ্বারা সমাজেরও প্রচুর উপকার সাধিত হচ্চে।

সঙ্গে সঙ্গে ছায়া-চিত্রের উপযোগী সামাজিক কাহিনীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্চে। দর্শককে খুসী রাখতে হ'লে আজ আর দুর্বল, প্রাণহীন কাহিনীর দ্বারা তা সম্ভবপর নয়।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে বর্জন কোরে আজ আর প্রডিউসারদের চলবার উপায় নেই। পরিচালকদের উপর নির্ভর কোরে তাঁরা অনেক আক্কেল সেলামী দিয়েছেন। ভাল কাহিনীর জন্য, সংলাপ ও চিত্র-নাট্য রচনার জন্যে, সাহিত্যিকের সহযোগিতা আজ অপরিহার্য হ'য়ে উঠেচে।

এদিকে বোম্বাইওয়ালাদেরও ধীরে ধীরে দিব্য-দৃষ্টি খুলতে সুরু কোরেছে। বাঙালী সাহিত্যিকের লেখা বহু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে সারা ভারতে সুখ্যাতি লাভ কোরেচে।

ছায়া-চিত্রের সাফল্যের বারো আনাই নির্ভর করে তার কাহিনীর উপর। সে কাহিনী হওয়া চাই ঘটনাপ্রধান, গতিপ্রধান ও সম্পূর্ণ গতানুগতিকতা বর্জিত, মৌলিক। দর্শক-চিত্তে নানা রসের আলোড়ন সৃষ্টি করবার মত মাল-মশলার অভাব ঘটলে তা ছবির পর্দায় কখনও সাফল্য অর্জন কোরতে পারে না।

প্রাণহীন, অযোগ্য কাহিনী অবলম্বনে গঠিত কোন ছবি, টেক্‌নিকের দিক দিয়ে হাজার উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও তা' দর্শক-চিত্তকে আকৃষ্ট কোরতে পারে না।

যাঁরা চিত্র-নাট্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের সাহিত্যবোধ, রসবোধ এবং নাট্যবোধের উপরেই আরব্ধ কর্মের মূল সাফল্য নির্ভর করে। এই শ্রেণীর অভিজ্ঞ এবং রসজ্ঞ চিত্র-নাট্যকারের আমাদের দেশে খুবই অভাব। চিত্র-নাট্য রচনার বাঁধা-ধরা টেকনিক যেমন নিখুঁৎ হওয়া চাই, তেমনি চাই মূল কাহিনীটির রসহানি না ঘটিয়ে, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট না কোরে, তাকে যথাযথভাবে ছবির উপযোগী কোরে সাজিয়ে তোলার যোগ্যতা।

কত অযোগ্য চিত্র-নাট্যকারের হাতে পড়ে' কত ভাল কাহিনীর যে প্রাণহানি ঘটেচে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা শক্ত।

কাহিনীর জীবন-মরণ নির্ভর করে যেমন চিত্র-নাট্যকারের হাতে, তেমনি ছবির সাফল্যের মূলে পরিচালকের দায়িত্বও অসীম। পরিচালকের মধ্যেও চাই সাহিত্য এবং ড্রামা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম রসবোধের বিকাশ।

ছায়া-চিত্রে, শিল্পীরা হ'চ্চেন পরিচালকের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। চিত্র-পরিচালকের filmic conception যত সূক্ষ্ম হবে, ড্রামা সম্বন্ধে জ্ঞান হবে যত গভীর, সাফল্যের পথ তাঁর ততই সুগম হ'য়ে আসবে। চরিত্রানুযায়ী অভিনয়-শিক্ষাদানের ক্ষমতাও তাঁর পূর্ণ মাত্রায় থাকা চাই।

কদাচিৎ একটি মাত্র লোকের মধ্যে এতগুলি গুণের সমন্বয় ঘটে। দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা ভিন্ন এই সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া যায় না।

ছায়া-চিত্রের পরিচালনা-কার্যে যাঁরা যথার্থ অভিজ্ঞতা দাবী করবার অধিকারী, সারা ভারতে আজ তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

মুখর ছবির অভ্যুদয়ের পর থেকে, গত দশ বৎসরে ছায়া-চিত্রের টেক্‌নিকের যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে সত্য—কিন্তু তার গলদও আছে ঢের। যে-সব প্রডিউসার এই সব দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরাই শিল্পের যথার্থ বন্ধু।

এগুলি আজ ধীরভাবে চিন্তা করবার দিন এসেচে।



আজ চিত্র-রাজ্যে যে প্রতিযোগিতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বারা ফিল্ম-শিল্পের প্রভূত উপকার হবে। বিনা প্রতিযোগিতায় কোন ব্যবসায়েরই পুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

জীবন-সংগ্রামে যাঁদের এগিয়ে যাবার মত পাথেয় ও মনের বল আছে, তাঁরাই শুধু বেঁচে থাকবার অধিকারী। Survival of the fittest—এই নীতি আজ সব ক্ষেত্রেই প্রোযজ্য।

যাঁরা ফিল্ম-শিল্পের যথার্থ হিতৈষী, তাঁরা একে রাহুমুক্ত, গ্রহমুক্ত দেখতে চাইবেন। শুধু সাধারণ দর্শকের দাবী মেটাবার মধ্যেই প্রডিউসারের কর্তব্য শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ শিল্প-রসিকের রসের ক্ষুধা মেটানো চাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, box-officeএর দিক থেকে প্রচুর সাফল্যের সন্ধান দিলেও, সে-ছবি রসিকের মনের ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম হয় না। Class এবং Mass—এই উভয় দলের চাহিদা যাঁরা এক যোগে মেটাতে পারেন, তাঁদের প্রতিভার দানকে আমরা স্বীকার করি, শ্রদ্ধা করি।

সেই সুদিনের দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম যেদিন আমাদের চোখের নেশা মেটবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার উপযোগী সত্যিকারের ভাল ছবি দেখতে পাব।

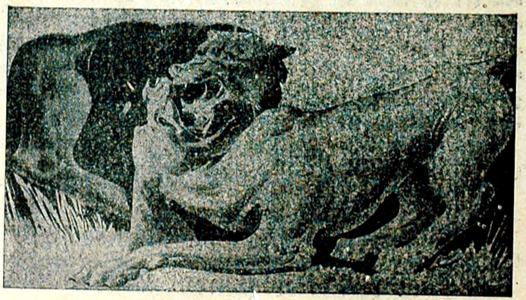

# পণ্য-পরিচিতি

## গ্লোব নার্শরীর নূতন ষ্টল

গত পনেরোই জুলাই সোমবার গ্লোব নার্শরী শিয়ালদহ মেইন ষ্টেশনের পাঁচ নম্বর প্লাটফরমে একটি নূতন ষ্টল খুলিয়াছেন। ষ্টলটিতে নানাবিধ চারা, ফুলগাছের সুন্দর সমাবেশ হওয়ায় উহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই ষ্টলে সকল প্রকার ফুল ও শব্জীর বীজ, চারা, কৃষি বিষয়ক পুস্তকাদি, বিভিন্ন প্রকারের ফুল প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই ইহাতে যাত্রী ও জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান গ্লোব নার্শরী উহার স্বত্ত্বাধিকারী মিঃ এ, এন, রায় কর্ত্তৃক ১৯১৮ সালে শ্যামবাজারের অতিসাধারণ একখানি কাঁচা ঘরে স্থাপিত হয়। মিঃ রায় পূর্ব্বে আচার্য্য স্যার পি, সি, রায় এবং স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণাগারের বেয়ারার কার্য্য করিতেন। একমাত্র কৃষির উন্নতিতেই দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে, মিঃ রায় ইহা বুঝিতে পারিয়া খাঁটী এবং সতেজ চারা ও বীজ এবং গোলাপ ও অন্যান্য ফুল এবং নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য চারা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই নার্শরীর পত্তন করেন। তখন উহা 'রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৯ সালে রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এম্পারার নার্শরী নামক একটী নার্শরী কিনিয়া লইয়া উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনে 'গ্লোব নার্শরী' নাম গ্রহণ করেন। দমদমায় গৌরীপুরে এই নার্শরীর প্রায় একশত একর জমি আছে। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নানাবিধ ফুল ও চারার চাষ এবং কলম প্রস্তুত হয়। তাঁহাদের একটী পক্ষী-পালন বিভাগও আছে। সেখানে একজন বিশেষজ্ঞের অধীনে পায়রা এবং নানাবিধ গৃহপালিত-পক্ষী জন্মান হয়। কৃষি সম্পর্কীয় তথ্যাদি সাধারণ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে নার্শরী হইতে 'কৃষি-লক্ষ্মী' নামক একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হইয়া থাকে। মিঃ রায় স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে কৃষি সম্পর্কে সহজবোধ্য কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। সাধারণ কৃষকগণও ঐ সকল পুস্তক পাঠে অতি সহজে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিতে পারে। ১৯৩৪ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধার্থ কলেজষ্ট্রীট মার্কেটে একটী ষ্টল খোলা হয়। সেখানেও নানা প্রকার ফুল ও শব্জীর চারা ও বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

সুখের বিষয়, ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য 'গ্লোব নার্শরী' যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

---

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীটের 'আর্থিক জগৎ প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়

জগন্মাতা
শিল্পী—নিকোলাস রোরিক